প্রেমের পরশ।

(উপন্যাস)



শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী।

১৩৪২

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

৪৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভূদেব প্রিন্টিং এণ্ড
পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

---

৪৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বুধোদয় প্রেস হইতে
শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু

দাদা !

আমার ছোট বেলাকার লুকিয়ে রাখা অকিঞ্চিৎকর রচনাগুলি একদিন তোমার আগ্রহেই সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইটুকু সুযোগ আর উৎসাহ না পাইলে হয়ত আমার সাহিত্য-সাধনা এতদূরও অগ্রসর হইত না। সেজন্য আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে ভাল মন্দ না বাছিয়া এই পুস্তকখানি আজ তোমার নামেই উৎসর্গ করিলাম।

স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী—ভগ্নী

প্রেমের পরশ

এক

নিদাঘের ক্লান্তিভরা দীর্ঘ মধ্যাহ্ন। দ্বিপ্রহর বেলায় নিঝুম নিস্তব্ধতা মহান গভীর কলিকাতার জনতা চঞ্চল রাজপথে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু জনতা কোলাহল হইতে দূরে অবস্থিত বিশ্রাম-সুখাভিলাষী ধনিগৃহে এখন নীরবতারই পূর্ণ রাজত্ব।

কলিকাতার বিখ্যাত এটর্ণী কিরণপ্রকাশ চৌধুরী মহাশয়ের বৃহৎ ভবনের সুসজ্জিত শয়নকক্ষে, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী শ্রীমতী অনুপমা সুন্দরী কুসুমশয্যায় শায়িতা হইয়া তন্দ্রাতাড়িত নয়নে একখানি চিত্তাকর্ষক চমকপ্রদ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। পার্শ্বে শিশুকন্যা খুকী নিদ্রিতা। স্থান কাল সময় সমস্তই নিদ্রাকর্ষণের পক্ষে অনুকূল। মধ্যাহ্নের শান্তিপূর্ণ গাঢ় নিস্তব্ধতা, গৃহসংলগ্ন উদ্যানে অবিরাম ভাসিয়া আসা ঘুঘু দম্পতীর সকরুণ অলস রাগিণী, কক্ষদ্বারে বিলম্বিত ঘন সবুজ পরদাগুলির শ্যামল স্নিগ্ধতা, এবং অবিশ্রান্ত ঘূর্ণিত বৈদ্যুতিক ফ্যানের শীতল বায়ুপ্রবাহ, পাঠ-নিরতা সুন্দরীর চক্ষুদুটী ঘুমের আবেশে জড়াইয়া দিতেছিল। কিন্তু বিস্ময়াবহ রহস্যময় উপন্যাসের বিচিত্র আখ্যানভাগ তাঁহাকে এতই বিমুগ্ধ ও কৌতূহলী করিয়া তুলিয়াছিল যে, বইখানি তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছিলেন না। তন্দ্রার আবেশ জোর করিয়া কাটাইয়া অনুপমা দেবী পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ অশ্রান্তভাবে পড়িয়া যাইতেছিলেন।

রহস্য ক্রমেই গভীর হইয়া আসিতেছিল। যেখানটীতে গল্পের নায়িকা কনকনলিনী তাহার প্রেমাস্পদের বিপন্ন জীবন রক্ষা করিবার জন্য নিষ্ঠুর নৃশংস আততায়ীর উদ্যত ছুরিকার মুখে তাহার শুভ্র সুকোমল বক্ষখানি অম্লানবদনে হাসিতে হাসিতে পাতিয়া দিল এবং সেই শোণিত-লিপ্সু তীক্ষ্ণধার তরবারী তরুণী কনকনলিনীর কুসুম-সুকুমার উন্নত হৃদয়খানি এক আঘাতে ভেদ করিয়া তাহাকে নিমেষে ধরাশায়িনী করিল, যেখানে নায়ক অরিন্দম প্রিয়তমার সেই বালক-নখর-ছিন্ন প্রস্ফুটিত রক্তকমলিনীবৎ রুধিরাপ্লুত, ধূল্যবলুণ্ঠিত এলায়িত দেহখানি সযত্নে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া শোকাকুল বিভ্রান্তচিত্তে "কেন এমন কাজ করলে নলিনি? অভাগার তুচ্ছ প্রাণ রক্ষা করতে তোমার এ অমূল্য জীবন কেন বিসর্জ্জন দিলে? তোমা হারা হয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকায় আমার কি সুখ?" এইরূপ উচ্ছ্বসিত সকরুণ আর্ত্তবিলাপ ও হাহাকারে পাঠিকাগণের প্রাণে সমবেদনা ও চক্ষে অশ্রুর আভাস জাগাইবার চেষ্টা করিতেছিল এবং সে চেষ্টা সফল করিয়া মুগ্ধ পাঠিকা অনুপমার চক্ষে যথার্থই অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই খানটীতেই অনুপমা বাধা প্রাপ্ত হইলেন। বাহিরে কয়েক জনের সম্মিলিত পদশব্দ শুনা গেল। এই আকস্মিক রসভঙ্গে কিছু বিরক্ত হইয়া অনুপমা তাঁহার কল্পিত নায়ক নায়িকার দুঃখে অশ্রুসিক্ত চক্ষুদুটী তাড়াতাড়ি অঞ্চলে মুছিয়া ফেলিলেন এবং বইখানি উপাধানের উপর উপুর করিয়া রাখিয়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন।

পরক্ষণেই দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, গৃহস্বামী চৌধুরী মহাশয় তাঁহার পুত্র অরুণপ্রকাশ এবং বালিকা কন্যা মায়াময়ী। মায়া জননীর মুখচন্দ্রের ছল ছল ভাব দেখিয়া তাঁহার কোলে ঝাপাইয়া পড়িয়া সবিস্ময়ে বলিল, "একি মা! তুমি কাঁদছিলে নাকি?"

মাতা হাসিয়া বলিলেন, "দূর পাগ্লী! কাঁদব আমি কোন্ দুঃখে? অনেকক্ষণ ধরে বই পড়ছি কিনা?" তাহার পর কর্তার দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে বড় সকাল সকাল?"

কর্তা তাঁহার, দীর্ঘ সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলে উঠার শ্রমে ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত স্থূল বপুখানি দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় ন্যস্ত করিয়া প্রফুল্ল স্মিতবদনে কহিলেন, "হাঁ, সুখবরটা তোমাকে নিজের মুখেই দেব বলে তাড়াতাড়ি চলে এলুম!"

"কিসের সুখবর গো?" উত্তর প্রত্যাশায় অনুপমা স্বামীর মুখের দিকে সাগ্রহে চাহিয়া রহিলেন।

হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "আজ যে বি. এ'র রেজাল্ট বেরুল, অরুণ আমাদের পাশ হয়ে গেছে, শুধু পাশই নয়, ফাষ্ট ডিভিসনে।"

অনুপমা সে সুসংবাদে আনন্দিত হইলেন কি বিষাদিত হইলেন তাহা ঠিক বুঝা গেল না। তিনি ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, "তাই নাকি? কিন্তু খবরটা তোমার কাছেই সর্ব্বপ্রথম কি করে গেল?"

সুন্দর প্রিয়দর্শন যুবক অরুণ মাতৃ-চরণে প্রণত হইয়া কিছু লজ্জিত ভাবে কহিল "রেজাল্ট দেখেই আমি তাড়াতাড়ি বাবার কাছে গেছলুম যে।"

"বেশ?"

অনুপমা সপত্নীপুত্রের কল্যাণ কামনায় কি আশীর্ব্বাদ বাণী উচ্চারণ করিলেন, তাহা শ্রুতিগোচর হইল না, শুধু ঠোট দুখানি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। তবে অরুণের এই সাফল্য সংবাদ তাঁহার পক্ষে যে বিশেষ প্রীতিকর হয় নাই, তাহা মুখ চক্ষের অপ্রসন্ন ভাব ও অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বেশ বুঝাযাইতেছিল। গৃহিণীর ভাবগতিক দেখিয়া চৌধুরী-

মহাশয়ের হর্ষোচ্ছ্বসিত চিত্ত কিছু দমিয়া গেল। বহুদিন পরে আজ স্মরণ হইল তাঁহার পরলোক-গতা প্রথমা পত্নীর কথা। অরুণের জননী আজ জীবিত থাকিলে প্রাণাধিক পুত্রের সফলতায় কিরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেন, তাহা মনে করিতেই তাঁহার চক্ষের পাতা ভিজিয়া উঠিল। তিনি একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভারি গলায় কহিলেন, "তা'হলে আজতো আর সময় নেই কাল সকালে কালীঘাটে পূজোটা পাঠিয়ে দিও মনে করে।"

এমন সময় বালিকা মায়া অরুণের মনের উচ্ছ্বসিত আনন্দ গোপন করিবার চেষ্টায় আরক্ত সঙ্কুচিত মুখের পানে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া জননীকে বলিল, "আর, মা, দেখো, দাদার সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের এইবার একদিন নেমতন্ন করে খাওয়াতে হবে বুঝলে? তারা দাদা পাশ হলে খাবে বলে কবে থেকেই হাত ধুয়ে বসে আছে। হ্যাঁ মা, তাহলে বেশ হবে, মজা করে খুব গান শোনা যাবে। দাদা নিজে গান ভালবাসে, তাই ওর বন্ধু-বান্ধবরাও সব একসে এক গাঁইয়ে—ওকি দাদা পালাচ্ছ কেন?"

অরুণ জানিত বিমাতার নিকট তাহার স্নেহের দাবী করাই অন্যায়, সেজন্য স্বীয় মনের ইচ্ছা ভগিনী মুখে ব্যক্ত হইতে দেখিয়া সে সঙ্কোচভয়ে পাশ কাটাইতেছিল। মায়া হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে ছুটিয়া আসিল, বলিল "আচ্ছা এখন তোমার ঘরেই চলো দাদা, সে দিনে কি রকম কি করা যাবে, দুজনে মিলে এইবেলা তার একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলা যাক্।" অরুণের হাত ধরিয়া সে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

গমনপর পুত্রের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া চৌধুরী মহাশয় মমতা-স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আহা ভগবানের দয়ায় বেঁচে থাকেতো অরু আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।"

অনুপমার ব্যাপারটা যেন বাড়াবাড়ি বোধ হইতেছিল, এযে বাস্তবিক আদিখ্যেতা, আর যেন কাহারও ছেলে কখনও বি এ পাশ করে নাই!

অরুণ দৃষ্টির অন্তর হইতেই তিনি গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীরতর করিয়া শ্লেষের সহিত বলিলেন, "হ্যাঁ, বংশের মুখ উজ্জ্বল ত করবেই, ছেলে এরি মধ্যে যে রকম গুণের গুণনিধি হয়ে উঠছেন!"

কথাটা শুনিয়া চৌধুরী মহাশয় চকিত হইয়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন? তুমি আজ একথা কেন বলছ অনু? অরুর চরিত্রে তুমি কি কোনও রকম দোষ দেখ্‌তে পেয়েছ? আমি তো তাকে এপর্য্যন্ত নির্দ্দোষী বলেই জানি।"

"তাতো জান্‌বেই, ছেলের দোষের দিকটা তো তুমি কোনও দিনই দেখ্‌তে পাও না। ছেলে বি-এ পাশ করেছে সেই আহ্লাদে একেবারে ফুটিফাটা হচ্ছ, ওদিকে সে যে ভেতরে ভেতরে কি কীর্ত্তি কর্‌ছে তার কিছু খবর রাখো?"

পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় চৌধুরী মহাশয় অতিমাত্র ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেজন্য গৃহিণীর দীর্ঘ ভণিতায় বিরক্ত ও অধৈর্য্য হইয়া ব্যগ্রতার সহিত কহিলেন, "আহা! অরুণ কি করেছে, সেটা খুলেই বলো না ছাই! মিছে বাজে কতকগুলো বকে' কি লাভ?"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অনুপমা বলিলেন, "বাজে বকছি বই কি? তোমাকে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দিলে বুঝি দেখ্‌তে পাও না? জলের মতন পয়সা খরচ করে এই যে সব নিত্য নতুন আমোদ প্রমোদ করা হচ্ছে, আজ থিয়েটার, কাল সিনেমা, পরশু গার্ডেন পার্টি, এসব বাবুয়ানীর ফলটা শেষকালে কতদূর দাঁড়াতে পারে, সেটাও কি বোঝবার ক্ষমতা নেই তোমার?"

"ওঃ! এই কথা, আমি বলি না জানি কি অঘটন ঘটেছে!" চৌধুরী

মহাশয় একটা স্বস্তির নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া সহজ কণ্ঠে কহিলেন, "এসব আমোদ প্রমোদ আজ কালকার দিনে যার ত পয়সা সংস্থান আছে, সে যে করেই থাকে অনু! ওটা বাবুয়ানী হলেও দোষের কথা ত নয়। আর আমোদ আহ্লাদ করবার এইত বয়স, এর পর সংসার ঘাড়ে পড়লে কি আর এসব করতে পারবে? তবে বৃথা অপব্যয় করাটা আমিও পছন্দ করি না বটে, কিন্তু কি করি? বংশের মধ্যে ঐত একটি ছেলে, তায় আবার মাতৃহীন, ও পাছে মনে কোনও ব্যথা পায়, তাই এসব বিষয় মানা নিষেধ করতে পারি না। এর পর সময় মত একদিন বুঝিয়ে বল্লেই হবে।"

স্বামীর কথায় অনুপমার অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি হইল, তিনি মুখখানা আরও ভার করিয়া বলিলেন, "তোমার ঐ এককথা! মাতৃহীন! মাতৃহীন তাতে হয়েছে কি? মায়ের অভাবে ওকে কোন্ কষ্ট, কোন্ দুঃখ পোয়াতে হচ্ছে শুনি? তুমি ঐ রকম অন্যায় আদর আবদার দিয়েই ত ছেলেটার ইহ পরকাল মাটী করতে বসেছ। যদি তা'র আমোদ আহ্লাদের সীমা এই পর্য্যন্তই থাকত তা হ'লেও বা বুঝতুম, তাত নয়, সঙ্গে যে ক্রমশঃ আরো উপসর্গ জুটছে।"

"সে আবার কি?"

গৃহিণী তখন কর্ত্তার আরও কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদু গুঞ্জনে যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,—তাঁহার আদরের দুলাল আজকাল নাকি গান শুনিবার ছুতা ধরিয়া গোপনে থিয়েটারের বড় বড় অ্যাক্‌ট্রেসের কাছে গতিবিধি আরম্ভ করিয়াছেন, সংবাদটা কোনও বিশ্বস্তসূত্রে তিনি অবগত হইয়াছেন, সুতরাং সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই।

শুনিয়া কর্ত্তার মুখ গম্ভীর বিমর্ষ হইয়া উঠিল। তিনি উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "তাই নাকি? কিন্তু কথাটা আমাকে এতদিন জানাওনি

কেন? আমার অতশত তলিয়ে দেখবার সময় কোথায়? সদাসর্ব্বদা কি রকম কাজের ভিড় দেখেছ ত?"

অনুপমা তাম্বূলরসসিক্ত বাঙ্গা ঠোঁটখানি ফুলাইয়া অভিমানমাখা মিষ্টস্বরে বলিলেন, "কি করে বলি বল? এমনেই তো সৎমার নাম বদনাম হয়ে রয়েছে, সকলের কাছে আমার নিন্দে রটিয়ে বেড়ায়। তার ওপর যদি তোমার কাছে ভাল মন্দ দুকথা বলি, তাহলে তো রক্ষেই নেই, বলবে সৎমা লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে—"

বাধা দিয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "এযে অন্যায় কথা! সত্যি বললে সেটা কি লাগানো ভাঙ্গানো হল? রোগটা ধরতে না পারলে তা'র প্রতিকার করা যায় কেমন করে বলো?"

খুকী জাগিয়া খুঁৎ খুঁৎ আরম্ভ করিল, অনুপমা তাহাকে চাপড়াইতে চাপড়াইতে পুনরায় ঘুম পাড়াইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না?"

গৃহিণীর সেই কথা ও মুখের ভাবে উৎসাহিত হইয়া কর্ত্তা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কাজ?"

"ভেবে দেখলুম অরুণকে শোধরাবার এখন একমাত্র উপায় আছে, ধর-পাকোড় করে' এই বেলা তা'র বিয়েটা দিয়ে ফেলা। তবে পাত্রীটি যেমন তেমন হলে চলবে না, সুন্দরী তো হবেই. তা ছাড়া বেশ একটু বড় সড় আর চালাক চতুর গোছ হওয়া চাই, ওকে সায়েস্তা করতে পারে এমনি মেয়ে।"

কর্ত্তা এতক্ষণে যেন অকূলে কূল দেখিতে পাইলেন। গৃহিণীর তীক্ষ্ণবুদ্ধির বিস্তর তারিফ করিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু এরকম পাত্রী ত সহজে পাওয়া যাবে না, তা'র জন্যে খোঁজ তল্লাস করতে হবে।"

"কিন্তু আমার সন্ধানে ঠিক এই রকমই একটি মেয়ে আছে।"

"সত্যি নাকি? তুমি কা'র কথা বলছ অনু?"

অনুপমা মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "তাকে তুমিও দেখেছ বাঁকিপুরে।"

কর্ত্তা বিস্মৃত স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "বাঁকিপুরে? কই না সেখানে এরকম কোনও মেয়ে দেখেছি বলে ত মনে পড়ে না।"

অনুপমার পিত্রালয় বাঁকিপুরে। কর্ত্তার স্মরণ শক্তির বহর দেখিয়া তিনি বলিলেন "আ মরি! এরি মধ্যে ভুলে গেলে বুঝি? গেল বছর পূজোর বন্ধে আমরা যখন বাঁকিপুরে যাই, তখন সেখানে আমার সইয়ের মেয়ে শতদলকে তুমি দেখোনি নাকি? সে যে আমাদের মায়ার সঙ্গে খেলা করতে রোজই আসত। মেয়েটি চমৎকার সুন্দরী, নামেও শতদল, রূপেও শতদল। লেখাপড়াও মন্দ শেখেনি, গাইতে বাজাতেও অল্প স্বল্প পারে, আজ কালকার ছেলেরা ঐরকম মেয়েই পছন্দ করে জানত?"

বাস্তবিক রূপে শতদলতুল্যা না হইলেও গৃহিণীর সখীকন্যা দেখিতে শুনিতে মন্দ ছিল না, কিন্তু সেই সাধারণ মেয়েটিতে এমন কোনই বৈশিষ্ট্য ছিল না, যাহাতে সে ধনী পিতার একমাত্র দুলাল সুরূপ সুকান্তি শিক্ষিত অরুণের পার্শ্বে অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে।

স্বামীকে নীরব দেখিয়া অনুপমা বলিলেন, "মনে পড়ল না বুঝি? বারে! খুব ত স্মরণশক্তি তোমার!"

গৃহিণীর অসন্তুষ্টির ভয়ে মনের খুঁৎখুঁতানি প্রকাশ না করিয়া চৌধুরী মহাশয় দ্বিধাগ্রস্তভাবে কহিলেন, "হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কিন্তু আমাদের অরুণের সঙ্গে কি তাকে ভাল মানাবে?"

"কেন? না মানাবার কারণটা কি? রংয়ের জেল্লা নাই থাক, কিন্তু মেয়েটার গড়ন পিটন কেমন সুন্দর—"

"উহু, সে কথা বলছি না, আমি বলছিলুম মেয়েটা বড় ছোট না?"

"ওমা! সে কি কথা? সে মেয়ে যে তখনি বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছিল, সই আমাকে কত করে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিলে একটী ভাল দেখে সম্বন্ধ করতে, তার পর এই বছর গেছে, এদ্দিনে আরো কত ডাগর হয়ে উঠেছে, মেয়েদের বাড় যে কলাগাছের বাড়। তবে সইদের অবস্থা ভাল নয়, দিতে থুতে কিছু পারবে না, এই যা এক বাধা।"

"তার জন্তে কিছু আটকাবে না, ভগবানের দয়ায় তোমার ঘরে তো কিছুর অভাব অপ্রতুল নেই, অনু! অরুণ যদি মেয়েটীকে পছন্দ করে তা'হলে তার বিয়ে ঐখানেই হবে।"

অনুপমা আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "তা'হলে আজই এ বিষয় সইকে লিখেদি?"

"আজ থাক্ না। এত তাড়াতাড়ি কিসের!"

"শুভ কাজে বিলম্ব করতে নেই জান ত? শতদলকে বউ করলে তোমার ছেলের জন্যে আর কোনও ভাবনাই ভাবতে হবে না। সে যে রকম বুদ্ধিমতী মেয়ে, দুদিনেই তা'কে বশ করে হাতের মুঠোয় করে ফেলবে। তখন এ সব বদ্ খেয়ালী ছেড়ে বাছাধন দিনরাত বৌয়ের আঁচল ধরে ঘরের কোণে পড়ে থাকবেন। তুমি দেখো না!"

গৃহিণীর ভবিষ্যদ্বাণীতে আশ্বস্ত হইয়া চৌধুরী মহাশয় সহাস্তে কহিলেন, "তা তোমার যা ভাল বিবেচনা হয় করো, অনু! এসব হাতের মুঠোয় করার ব্যাপার তোমরাই বোঝো ভাল!"

স্বামীর সম্মতি লাভ করিয়া অনুপমা বিজয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সপত্নীপুত্রের এই মঙ্গলকামনার মূলে তাঁহার দুইটী উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। প্রথম এই সুযোগে বাল্যসহচরীর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া সখীত্বের বন্ধন দৃঢ় ও চিরস্থায়ী করা, দ্বিতীয়, কর্ম্মিষ্ঠা, আজ্ঞানুবর্ত্তিনী অনুগতা পুত্রবধূ লাভ।

তিনি আর বিলম্ব না করিয়া সেইদিনই সখীকে এই আনন্দের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং স্বামীর উপর স্বীয় আধিপত্য ও প্রাধান্য দেখাইয়া সগর্ব্বে লিখিলেন, কেবল তাঁহার কথা রাখিবার জন্যই কর্ত্তা এ প্রস্তাবে এত সহজে সম্মত হইয়াছেন, নহিলে অরুণের মত ছেলের পাত্রীর অভাব কি? কত লোক কত পরীর মত মেয়ে লইয়া সাধাসাধি করিতেছে।

চিঠি পাঠাইয়া অনুপমা উত্তর আসিবার দিন গণিতে লাগিলেন। কিন্তু উত্তর আসিল না; আসিল তাঁহার সখীকন্যা শ্রীমতী শতদল বাসিনীর শুভবিবাহের রঙ্গীন নিমন্ত্রণ পত্র। পাত্রটী অনুপমার পরিচিত এক কেরাণীপুত্র। এ সংবাদ পাইয়া অনুপমার মন বিরাগে ভরিয়া উঠিল। অমন পদ্মফুলের মত মেয়েটি শেষে কিনা সামান্য কেরাণীর ঘরে পড়িল! সখীর বুদ্ধিকে শত শত ধিক্কার দিয়া এবং মেয়েটীর দুরদৃষ্টের জন্য আপশোষ করিয়া অনুপমা এবার পাত্রী অন্বেষণের ভার স্বামীর উপর ন্যস্ত করিলেন এবং পুনরায় তাস খেলিয়া উপন্যাস পাঠ করিয়া তিনি দিব্য আরামে নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইতে লাগিলেন।



দুই

অরুণপ্রকাশের যখন মাতৃবিয়োগ হয়, তখন তাহার বয়স এগারো কি বারো হইবে। সুতরাং স্নেহময়ী মাতার ব্যথাময় স্মৃতিটুকু কিছুতেই তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল না। সেজন্য মাতার মৃত্যুর পর ছয় মাস অতীত না হইতেই পিতা যখন শূন্যসংসার পূর্ণ করিতে ষোড়শী অনুপমাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে ঘরে লইয়া আসিলেন, তখন মাতৃহারা শোক-সন্তাপিত বালক সেই সম্পূর্ণ অপরিচিতা তরুণীটাকে কিছুতেই জননীর পরিত্যক্ত শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত করিতে পারিল না। 'মা' কথাটী মুখে আনিতেও তাহার মন কুণ্ঠা ও ব্যথায় ভরিয়া উঠিত। আর নববধূ অনুপমাও তাহার সে তরুণ বয়সে, যাহার সহিত বিন্দুমাত্র রক্তের সম্পর্ক নাই সেই অচেনা অদেখা কিশোর বয়স্ক সপত্নীপুত্রকে মাতৃহৃদয়ের মমতা বা বাৎসল্য স্নেহ দিতে পারিল না, সেজন্য দুইজনের মধ্যে বোধ হয় কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না। কারণ এক্ষেত্রে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তবে অরুণ অসহায় দুগ্ধপোষ্য শিশু হইলে ঘটনাটা অন্যরূপ দাঁড়াইতেও পারিত। মাতাপুত্রের স্নেহ সম্বন্ধটা তখন দ্বিধা ও সঙ্কোচের মধ্যে পড়িয়া হয়তো এমন বিকৃত ও জটিল সমস্যা হইয়া উঠিত না।

যাহা হউক সপত্নীপুত্রের প্রতি মমতাবতী না হইলেও ধনি-গৃহিণী অনুপমা ছেলেটীর জননীর অধিকার গ্রহণ করিয়া পরমোৎসাহে কর্তৃত্ব করিতে লাগিয়া গেলেন। পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্যপালনেও তাঁহার বিন্দু-মাত্র ত্রুটী দেখা যাইত না। অরুণের গতিবিধি, আচার ব্যবহার ও শিক্ষার দিকে তাঁহার অসম্ভব তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। পেটের সন্তান না হইলেও

ছেলেটীর ভবিষ্যৎ ও মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তায় বেচারি অনুপমার নাকি রাত্রে সুনিদ্রা দুর্লভ হইয়া উঠিত! "হ্যাঁ অরুণ! আজ যে এরি মধ্যে চলে এসে? স্কুল পলাতক হয়েছ বুঝি?" "ওকি? এই সাঁঝ সকালেই বিছানা নিলে যে? আজ কি মাষ্টার পড়াটড়া দেয় নি নাকি?" "বেশ করে মন দিয়ে লেখাপড়া করো বাবা! তুমি কত বড় বংশের ছেলে সেটা মনে রেখো।" "ওমা! কি হবে? অমন সুন্দর নতুন জামাটা দাতব্য করে ফেল্‌লে! বাপ কত কষ্টে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা উপার্জ্জন করছে দেখ্‌ছ ত? একটু বুঝে সুঝে চলতে শেখো।" "এত রাত অবধি কোথায় ছিলে অরুণ? খেলা করবার একটা সময় অসময় আছে তো? এখন দিন দিন সেয়ানা হচ্ছ, এরকম অনিয়ম করলে চলবে কেন?"

এইরূপ শাসন নিয়ম ও উপদেশের মধ্যে রাখিয়া অনুপমা সপত্নীপুত্রকে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও মাতৃত্বের প্রভাব পদে পদে জানাইয়া দিতেছিলেন। কিন্তু নির্ব্বোধ অরুণ তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে এহেন কর্ত্তব্যপরায়ণা হিতৈষিণী বিমাতার আদেশ উপদেশ বিধিমত মানিয়া চলিতে পারিত না। সে সংসারে নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বিমাতা ঠাকুরাণীর সান্নিধ্য যতদুর সম্ভব পরিহার করিতেই প্রয়াস পাইত।

অরুণের এই অবাধ্যতায় মনে মনে রুষ্ট হইলেও স্বামীর বিরাগের ভয়ে অনুপমা তাহার সহিত প্রকাশ্যে কোনও রূপ অসদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন না। তবে অরুণের বিরুদ্ধে নিত্য নূতন অনুযোগ ও অভি-যোগের সৃষ্টি করিয়া তিনি মাতৃহীন পুত্রের প্রতি স্বামীর প্রগাঢ় স্নেহ মমতা ক্রমেই শিথিল ও হ্রাস করিয়া তুলিতেছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অরুণ বিমাতা ঠাকুরাণীর নাকি "আয়ত্তের" বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল। পিতা যতক্ষণ ঘরে থাকিতেন, ততক্ষণই বাড়ীর ভিতর তাহার 'টিকি' নামক অ-দৃষ্ট পদার্থটী দেখা যাইত, অন্যভিন্ন বিশেষ প্রয়োজন না পড়িলে

সে বিমাতার ত্রিসীমানায় ভুলিয়াও পদার্পণ করিত না। সেজন্য অনুপমা প্রায়ই তাঁহার সঙ্গিনীদের কাছে আপশোষ করিতেন "যতই করো, তবু পরের ছেলে কি কখনও আপন হয়? যে গাছের ছাল সেই গাছেই লাগে। লোকে ছেলের দোষ তো দেখবে না, দেখবে কেবল সৎমার দোষ।"

অনুপমা কথাটা নেহাৎ মিথ্যা বলেন নাই, অরুণের মন বাস্তবিকই ঘরে বসিত না। পিতা ভিন্ন গৃহে তাহার আর কোনই আকর্ষণ ছিল না, কিন্তু সেই পিতার স্নেহ-সঙ্গও তাহার ভাগ্যে ক্রমেই দুর্লভ হইয়া উঠিতেছিল, তাই এখন পড়া শোনার ফাকে যেটুকু সাবকাশ পাইত সেটুকু বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া দিতেই ভালবাসিত। সে আমোদ প্রমোদে অবশ্য দোষের কথা কিছুই ছিল না, ধনিপুত্র এবং বিলাসী হইলেও অরুণের চরিত্র তখন পর্য্যন্ত অক্ষত ও নিষ্কলুষ ছিল, কিন্তু গৃহিণী সে কথা বিশ্বাস করিতেন না।

আসল কথা সপত্নীপুত্রের প্রতি স্বামীর এই অতিরিক্ত স্নেহাদর এবং প্রশ্রয়-প্রাপ্ত অরুণের এই সকল বৃথা অপব্যয় তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। অরুণ তো তাঁহাকে গ্রাহ্যই করে না, স্বামীকে এবিষয় কিছু বলিতে গেলে তিনিও "আহা! তাতে আর হয়েছে কি? ছেলে মানুষ একটু আমোদ আহ্লাদ করবে না? আর বংশের মধ্যে ত ঐ একটী ছেলে" বলিয়া কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। "বংশের মধ্যে ঐ ত একটী ছেলে" স্বামীর এই কথাটী যেন অনুপমার কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিত। সেজন্য তিনি তাঁহার দুরদৃষ্ট ও পোড়া বিধাতাকে শত সহস্র ধিক্কার প্রদান করিতেন। ভগবান দুটী দুটী সন্তান দিলেন—দুইটিই কি কন্যা সন্তান হইতে হয়? মায়া মেয়ে না হইয়া যদি ছেলে হইত, তাহা হইলে কি আজ সপত্নীপুত্র এমন করিয়া সৃষ্টিধর বংশধর আঁলালের ঘরের দুলাল হইয়া থাকিতে পারিত?

কিন্তু এই মায়া মেয়েটী ছেলে না হইয়া মেয়ে হওয়ায় তাহার মাতার যতখানি ক্ষতি হইয়াছিল, ঠিক ততখানিই লাভ হইয়াছিল অরুণের পক্ষে। এ স্নেহহীন সংসারে অরুণের অনাসক্ত উদাস মনখানিকে অকপট ভ্রাতৃস্নেহে বাঁধিয়া রাখিয়া ছিল শুধু এই ছোট মেয়েটীই। অরুণ তাহার এই ছোট বোনটীকে আন্তরিক ভালবাসিত। বালিকা মায়ার সরল মনে কোনও দ্বন্দ্ব কপটতা ছিল না, সে তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অরুণকে প্রকৃতই সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিত। তাহার অভাব অভিযোগ আদর আবদার সমস্তই সে নিজ সাধ্যমত মিটাইতে চেষ্টা পাইত। সে কারণে দাদার হইয়া মাতার সহিত কলহ করিতেও মায়া পশ্চাৎপদ হইত না। ভ্রাতা ভগিনীর এই সৌহার্দ্য ও মধুর প্রীতি-বন্ধন পিতাকে তৃপ্ত ও আনন্দিত করিলেও গৃহিণী এ ঘটনায় সুখী হইতে পারেন নাই। সপত্নী-পুত্রের সংসর্গে থাকিয়া পাছে তাঁহার পেটের সন্তানও পর হইয়া যায়, এই দুশ্চিন্তা তাঁহার মনকে সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিত।

চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রস্নেহের পরিমাণ যতই হউক, শিক্ষিত উদার-চিত্ত অরুণের চরিত্রে তাঁহার বিশ্বাস এপর্য্যন্ত অবিচলিত ছিল। কিন্তু গৃহিণীর কাছে সেদিন সেই দুঃসংবাদটা পাইয়া অবধি তাঁহার সে দৃঢ় বিশ্বাসও শিথিল হইয়া গেল। সেইদিন হইতে চৌধুরী মহাশয় পুত্রের গতিবিধির উপর গোপনে লক্ষ্য রাখিলেন, এবং তাহার অপব্যয়গুলি যাহাতে সংক্ষেপ হয় সে চেষ্টাও করিতে লাগিলেন।

তিন

"মাগো ! মা ! এতক্ষণে তোমার পূজো সারা হ'ল বউদি ? তোমার জন্যে যে আমি ঝাড়া ত'ঘণ্টা ধরে বসে আছি ! এতক্ষণ ধরে তুমি কি পূজো করো বউদিদি ? বিধবা জয়ন্তী প্রভাতের পূজাহ্নিক সারিয়া, স্নানার্দ্র বিমুক্ত কেশরাশির উপর গরদের শুভ্র অঁচিল খানা জড়াইয়া যখন প্রতীক্ষমাণা বেলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই ভক্তিমতী পূজারিণীর শান্ত সমাহিত পবিত্র মূর্তিখানির পানে চাহিয়া বেলা উক্ত প্রশ্ন করিল।

জয়ন্তী সে প্রশ্নে কিছু লজ্জিত হইয়া স্মিত হাস্যে কহিল, "অনেকক্ষণ বসে আছিস বুঝি ? তা আমি কি করে জানব বল্ ? সাড়া শব্দও দিস নি ত।"

"সাড়া শব্দ কি করে দেব ভাই ? জানলা দিয়ে উঁকি মেরে যে দৃশ্য দেখ্লুম, তুমি যে রকম পাষাণ মূর্তি হয়ে বসেছিলে, আমার আর টু শব্দটী করতে সাহস হল না, তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম। তাই বলছি অমন করে তুমি কি পূজো করো বউদি ? এইবার যোগযাগ আরম্ভ করলে নাকি ?"

একটুখানি ক্ষুব্ধ হাসি হাসিয়া জয়ন্তী বলিল, "যোগযাগ আমাকে কে শেখাবে ভাই ? মুখ্যুসুখ্যু মেয়েমানুষ পূজো অর্চ্চনারও বিশেষ কিছু জানি না।"

"তবে অতক্ষণ ধরে অমন নিস্পন্দ হয়ে বসে তুমি কি করছিলে ?"

"ধ্যান।

"তাই নাকি ?" বেলা কৌতূহলী হইয়া সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কা'র ধ্যানে তুমি এমন তন্ময় হয়ে যাও বৌদি ! সে কোন্ দেবতা ?"

"তিনি আমার ইষ্ট দেবতা।"

"তোমার ইষ্ট দেবতা কে বউদি ? নাঃ ইষ্ট দেবতার নাম মুখে আন্‌তে নেই বুঝি ? আচ্ছা তোমাদের এ নিয়ম কেন হোল বল তো ? ইষ্টদেবের নামটী মনে মনে সর্ব্বক্ষণ জপ করবে, অথচ মুখে উচ্চারণ করতেই যত দোষ, এর মানে কি ?"

জয়ন্তী বেলার সরল প্রশ্নের উত্তরে বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কি জানি ভাই ! বল্লুম ত আমি মুখ্যুসুখ্যু মেয়েমানুষ এসবের কিছুই বুঝি না। তবে এই টুকু জানি, যে নাম পৃথিবীতে সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে মধুর, সেটা প্রাণের মধ্যে লুকিয়ে রাখতেই ভাল লাগে, প্রকাশ করলে তা'র মাধুর্য্য তা'র মহত্ব ঠিক অনুভব করা যায় না। তবে আমার ইষ্টদেব চিরদিনই এমন গোপন অপ্রকাশ ছিলেন না বোন্ ! একদিন এ অভাগিনীকে দয়া করে তিনি প্রত্যক্ষ হয়েই দেখা দিয়েছিলেন, কিন্তু অভাগিনী তাঁর দেবত্বের মর্য্যাদা তখন বুঝতে পারেনি, দেবতাকে মানুষের চক্ষে দেখেছিল, তাই সেই ক্ষোভে সেই অপরাধেই বুঝি তার প্রাণের পূজা নিতে ধ্যানের দেবতারূপে অন্তরের গোপন মন্দিরে গিয়ে আসন নিয়েছেন !" কথার শেষ দিকটায় জয়ন্তীর গলার স্বর আর্দ্র কম্পিত হইয়া আসিল। সে যে এ কথাগুলি তাহার পরলোকগত স্বামীদেবতার উদ্দেশেই বলিতেছে, এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিয়া বেলাও বিষণ্ণ হইল। সংসারে একমাত্র সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী এই হিতৈষিণী নারীকে না বুঝিয়া ব্যথা দিয়া বেলা বড় অপ্রতিভ ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

তখন সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলিল,

"ওমা! কি বুদ্ধি আমার! সেই অবধি পাগলের মতন কি সব বকছি, আর তুমি যে এখন জলটুকুও মুখে দাওনি, সে কথা মনেও নেই। নিজের পেটটী ভরে আছে কি না?"

জয়ন্তী হাসিয়া বলিল, "তাতে কি হয়েছে? আমি সাত সকালে কবেই বা খেয়ে থাকি?"

"সাত সকালে নয় বৌদি! বেলা যে ঢের হয়েছে। যাও এখন শীগগির করে জলটল খেয়ে এসোগে, তারপর তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।"

"কি কথা ভাই?"

"বলছি, আগে তুমি খেয়ে এসো।"

বেলার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে জয়ন্তী ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া কিছু জলযোগ করিল। তার পর বেলার কাছে আসিয়া সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা বলছিলি বেলা?"

"বলছিলুম, জ্যাঠামশাই আপিসে গিয়েছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, আজ সোমবার তাই তাড়াতাড়ি গেছেন।"

"এরা কোথায়? মোহিত আর মিনি?"

"পাশের বাড়ীতে ক্ষিতুদের সঙ্গে খেলতে গেছে, তবে ত নিশ্চিন্ত হয়ে বসে দুদণ্ড পূজো করতে পারলুম। আচ্ছা এখন তোর কথাটা কি বল্ শুনি।"

বেলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বাধবাধ ভাবে বলিল, "তুমি যদি দয়া করে জ্যাঠামশাইকে একবারটী বলো বউদি, আমার জন্যে কোথাও একটা টিউশনীর যোগাড় করে দিতে, কোনও ভদ্রলোকের বাড়ী—"

নিরুপমা সুন্দরী তরুণী বেলার সেই প্রভাত অরুণ সম্পাতে বিকশিত প্রস্ফুট পদ্মের মত অমন ঢল ঢল লাবণ্যময় মুখখানির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে

চাহিয়া জয়ন্তী একটুখানি স্নেহের হাসি হাসিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "এ খেয়ালটা কি কোনও দিনই তোর মন থেকে যাবে না বেলা? তোর এই কাঁচা বয়স, এই লক্ষ্মীর মতন রূপ নিয়ে কার ঘরে চাকরী করতে যাবি ভাই? এ মোহিনীমূর্ত্তি নিয়ে তুই যেখানে যাবি সেইখানেই যে দেবাসুরের সংগ্রাম বেধে যাবে।"

বেলা লজ্জানত মুখে বলিল, "তোমার ঐ এক কথা! বউদি রূপ কি আর কোনও মেয়ের থাকে না? রূপ নিয়ে ঘরে বসে থাকলে ত চির দিন চলবে না, একটা কিছু উপায় করতে হবে।"

"কিন্তু বাবা কি এতে রাজি হবেন বেলা?"

"তাঁকে রাজি করতেই হবে বউদি! এমন করে তোমাদের অপরি-শোধ্য স্নেহের ঋণ আর কত বাড়াব বল?"

"আমরা ত তোকে পর ভাবি না বেলা।"

"তা জানি, তোমরা ভিন্ন এ পৃথিবীতে আমার আপন জন আর কে আছে ভাই? সেই জন্যেই ত আমার যত আবদার সব তোমাদের কাছে।"

তার পর একটু থামিয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বেলা বলিল, "কি জানো বৌদি, একটা কিছু কাজ পেলে তবু একটু অন্যমনস্ক থাকা যায়, এমন লক্ষ্যহীন ভাবে জীবন কাটানো যে বড় কষ্টকর। সময় যেন আর কাটতেই চায় না!

"কেন? তোর সময় কাটাবার ভাবনা কি? যে মোহিত মিনি রয়েছে, ওদের দৌরাত্ম্যে—"

বাধা দিয়া বেলা বলিল, "আহা! ও বেচারাদের ত কোনই গোল নেই বউদি! ওরকম বয়সে ছেলেরা কি রকম দুরন্ত পনা করে দেখেছ ত? আচ্ছা এখন উঠি, তুমি তোমার রান্না চড়াওগে, বেলা হয়ে গেছে।

জ্যাঠামশাইকে কিন্তু আজই একথাটা বলো বউদি, ভুলো না। আমি নিজেই বলতুম কিন্তু লজ্জা করে, জ্যাঠামশাই যদি কিছু মনে করেন ?"

জয়ন্তী একটু চিন্তিত ভাবে কহিল, "তা বলব, কিন্তু বেলা ! একটা টিউশনী করে তুই কতটাকাই বা উপার্জ্জন করতে পারবি ? তার চেয়ে—"

"তুমি স্কুলে পড়ানোর কথা বলছ বউদি ? তা'ও হবে, ক্রমশঃ ! আপাততঃ একটা টিউশনী পেলে কলেজে ঢুকে ইণ্টারমিডিয়েটটা দিয়ে দিই, তার পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। এ অসম্পূর্ণ বিদ্যে নিয়ে ত কোনও স্কুলে মাষ্টারী করা চলবে না, তাই চুপ করে আছি।"

এতক্ষণে বেলার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জয়ন্তী হাসিয়া বলিল, "ওঃ ! এই মতলব করা হয়েছে বুঝি ? তা বাবা ত তোকে কলেজ ছাড়তে তখুনি মানা করেছিলেন।"

"কলেজ না ছেড়ে কি করতুম ভাই ? উনি বুড়োমানুষ, এবয়সে কোথায় বিশ্রাম করবেন, তা নয় একটা সংসার ঘাড়ে করে রয়েছেন, এর ওপর আবার আমার কলেজে পড়ার খরচ যোগাবেন কোত্থেকে ? সে যে বোঝার ওপর বোঝা চাপানো হ'ত। আর তখন আমার মনের গতিরও ঠিক ঠিকানা ছিল না, কলেজে গেলেও পড়ায় মন দিতে পারতুম না বোধ হয়।"

জয়ন্তী একটু ভাবিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিল, "সে কথাও মিথ্যে নয়, তবে এত কাণ্ড করে লেখাপড়া বা চাকরী করার দরকারটা যে কি, সেটাই যে আমি বুঝলুম না ভাই !"

জয়ন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া বেলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ফের সেই কথা ! ও সব কিছু না করলে আমার জীবনটা কি করে কাটবে বউদি ! এইতো সবে কুড়িটি বছর কেটেছে, এখনও এ জীবনযাত্রার কত বড় দীর্ঘ পথ পড়ে রয়েছে তা কে জানে ?"

বেলার ফুটন্ত গোলাপের মত আরক্ত কোমল গাল দুটী আদরে টিপিয়া দিয়া জয়ন্তী সস্নেহ কণ্ঠে কহিল, "এ দীর্ঘ জীবনযাত্রার একজন উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে নেনা ভাই! তা হ'লেই ত সব দিক রক্ষে হয়, সকল হাঙ্গামাই মিটে যায়। আর এ রূপের প্রতিমা কি ভগবান্ মাষ্টারী করবার জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন বেলা?"

"তবে কি? রাজরাণী হয়ে সিংহাসনে বিরাজ করবার জন্যে?"

"তা মিথ্যে কি? এরূপ যে সিংহাসনেই মানায়!"

বেলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিন্তু দুঃখের বিষয় বউদি, সিংহাসন পাবার আপাততঃ কোনও সম্ভাবনাই নেই, তোমার বেলার জন্যে কোনও রাজা মহারাজাই পথ ভুলে আসছেন না।"

"ঠাট্টা নয় বেলা! রাজা মহারাজা নাই হ'ক, একটী ভাল সুপাত্র দেখে।"

"সুপাত্র কোথায় পাব বউদি? কুপাত্র বিস্তর আছে বটে কিন্তু সে যে আমার সারা জীবনের—"

জয়ন্তী গালে হাত দিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "তুই যে অবাক্ করলি বেলা! তোর মত মেয়ের আবার সুপাত্রের অভাব? এত রূপ, এত গুণ, ইচ্ছে করেই ঘরের কোণে লুকিয়ে রেখেছিস তাই, নইলে এদ্দিন কত সুপাত্র সেধে যেচে আসৃত। তা' হলে বাবাকে বলি একটা ভাল দেখে সম্বন্ধ—"

বাধা দিয়া বেলা ত্রস্তে বলিয়া উঠিল, "না বউদি! রক্ষে করো, ওসব হাঙ্গামে আমার পোষাবে না ভাই, তার চেয়ে তোমাদের স্নেহের আশ্রয়ে যেমন পড়ে আছি, তেমনি থাকৃতে দাও, মনে করো আমি তোমারই মত—"

"ষাট্! কি পাগলের মতন বকিস্ বেলা? আমরা ত তোকে

ছেড়ে দিচ্ছি না, তবে তোর ভালোর জন্যেই বলছি, মেয়েমানুষের জীবনে যেটা সব চেয়ে বড় সার্থকতা।”—

“সে সার্থকতা লাভের সুযোগ আমার জীবনে বোধ হয় কোনও দিনই আসবে না বউদি! সংসারের ভাবগতিক দেখে ও বিয়ে জিনিষ-টার ওপর আমার অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে।”

জয়ন্তী হাসিয়া বলিল, “আহা গো! তোর কতখানিইবা বয়স হয়েছে, সংসারে ভালমন্দ কতইবা দেখেছিস।”

“ভাল মন্দ দেখবার সুযোগ আমার এই বয়সেই যথেষ্ট পেয়েছি বউদি! আমি চিরদিন এমনি ঘরের কোণে থাকিনি তো! বাবা বেঁচে থাকৃতে তাঁর সঙ্গে সমাজে যাওয়া আসা, মেলা মেশা অনেক করেছি, তাই দেখে শুনে ঐ পুরুষ জাতটার ওপর আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে ভাই, ওদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে পদার্থ এত কম, যে ওদের নিয়ে আর যাই হ'ক, বিশ্বাস করে সর্ব্বস্ব দিয়ে ঘর সংসার করা চলে না।”

জয়ন্তী বেলার কথা বলিবার ভঙ্গীতে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, “তাই বুঝি চিরকৌমার্য্য ব্রত পালন করবার ব্যবস্থা হচ্ছে? পাগলী! পুরুষ যে পরশমণি তা জানিস্ না?”

বেলাও সহাস্যমুখে বলিল, “জানি, কিন্তু ও পরশমণিদের কাছ থেকে দূরে থাকাটাই আমি নিরাপদ মনে করি। এই বয়সে ঢের ত দেখলুম, কেউ চান রূপ, কেউ চান টাকা, অন্তরের সঙ্গে কারও কিছু কারবার নেই।”

“তা মানুষের মন ভোলাবার জন্যে প্রথমে একটা আকর্ষণ চাই ত তারপর বিয়ে থাওয়া হয়ে ভালবাসা ক্রমশঃ আপনিই জন্মায়, তখন—”

“তুমি আমাকে কেন ভালবাস বউদি? আমার রূপে মুগ্ধ হবার ত তোমার কথা নয়।”

"আমি ভালবাসি তোর মিষ্টি স্বভাব গুণে, স্নেহের টানে।"

"ব্যস্ এই রকম স্নেহের টানে আমাকে চিনে, শুধু আমাকে পাবার জন্যেই যে আমায় বিয়ে করতে চাইবে, তাকেই আমি স্বামিত্বের অধিকার দিতে পারি, নচেৎ চিরকুমারী থাকাই আমার ভবিতব্য।"

"তা তোদের সমাজে মেয়েপুরুষে চেনা পরিচয় হবার ত সুযোগ আছে। দেখে শুনে এমনি একটা পাকা জহুরীর সন্ধান করে নে না, যে এই অমূল্য রত্নটীকে চিনে তার উপযুক্ত আদর মর্য্যাদা করতে পারবে।"

বেলা হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উঁহুঁ! সে রকমটা পাওয়া সহজ নয় বৌদি! তাহলে বর খুঁজতেই কনে বুড়িয়ে যাবে! তার চেয়ে আমার এই ব্যবস্থাটা তুমি করে' দাও বউদি! লক্ষ্মীটী! তোমার দুটী পায়ে পড়ি জ্যাঠামশাইকে আজই আমার মিনতি জানিয়ে কথাটা বলো।" বেলা নত হইয়া সত্য সত্যই জয়ন্তীর চরণ স্পর্শ করিতে গেল, জয়ন্তী তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিল, "বলব ভাই! বলব, এর জন্যে এত অনুরোধ উপরোধ করা কেন?"

"তাহলে আমি যাই, মোহিত মিনি এলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।" যে কথাটা বলিবার জন্য বেলা কয়দিন হইতেই মনে মনে ছট্ ফট্ করিতেছিল, তাহা বলিয়া ফেলিয়া মনের ভার হালকা করিয়া লইয়া সে হৃষ্ট অন্তরে তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

চার

বেলার পিতা মহেশচন্দ্র রায় কৃতবিদ্য না হইলেও একজন উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। এ'গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে যাঁহার সহিত পাঠক পরিচিত হইয়াছেন, সেই এটর্ণী চৌধুরী মহাশয়ের অফিসে হেড ক্লার্কের কাজ করিয়া তিনি বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেন। সংসার প্রায় আত্মীয় পরিজন বর্জ্জিত, সুতরাং অভাব অনাটনও কিছু ছিল না। তথাপি জীবনের অধিকাংশ কাল মহেশবাবু অবিবাহিত অবস্থায় কাটাইয়া ছিলেন। এই অঘটন ঘটিবার কারণ, প্রথম যৌবনে তিনি নাকি এক প্রেমিকা সুন্দরীর প্রেমে পড়িয়া তাহাকে পাইবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং উক্ত সুন্দরীও মহেশবাবুকে স্বামিত্বে বরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। এ' বিবাহসম্বন্ধ পাকাপাকিই হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মহেশবাবুর মস্তকে বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। তাঁহার সেই অভীপ্সিতা সুন্দরী বিলাত হইতে সদ্য প্রত্যাগত এক নবীন ব্যারিষ্টারের গলে মাল্যদান করিয়া হতাশ প্রেমিকের বুকভরা প্রেমের স্বপ্ন এক কালে নিষ্ফল ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এই আশাভঙ্গজনিত দারুণ বেদনা, মহেশবাবুর তরুণ কোমল হৃদয়ে তখন এতই বিষম বাজিয়াছিল, যে তিনি মনে মনে শপথ করিয়া বসিলেন, অতঃপর, এই হৃদয়হীনা সুন্দরীকুলকে বিশ্বাস করিয়া আর কখনই হৃদয়ে স্থান দিবেন না। তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা বহুদিন অটল অবিচলিত ছিল। উক্ত ঘটনার পর কত সুন্দরীর প্রেম-যাচ্ঞা, প্রণয়-কটাক্ষ, কত কন্যাদায়গ্রস্তের আবেদন নিবেদন, তাঁহার সুদৃঢ় অবরুদ্ধ হৃদয়দ্বারে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু মহেশবাবু স্বীয় সংকল্পে অটল থাকিয়া মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ যৌবনকাল প্রায় সমস্তই

কৌমার অবস্থায় শূন্যগৃহে কাটাইয়া ছিলেন। তাহার পর কি জানি কেমন করিয়া তাঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হইল, বলা যায় না। এক সময় পূজার ছুটীতে কাশীতে বেড়াইতে গিয়া বিগতযৌবনে মহেশবাবু যখন এক হিন্দুঘরের বালবিধবার, পাণিগ্রহণ করিয়া নববধূ সমভিব্যাহারে কলিকাতা ফিরিলেন, তখন তাঁহার বন্ধুমহলে ও সমাজে ছিছিক্কার পড়িয়া গেল। তিনি যে প্রকৃতই একজন ভদ্রকন্যার সহিত পবিত্র পরিণয় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন, একথা অনেকেই বিশ্বাস করিল না।

বিশেষতঃ যে সকল কন্যাদায়গ্রস্ত ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের কন্যারত্নের ভার মহেশবাবুর ভারবহনোপযোগী বলিষ্ঠ স্কন্ধে চাপাইতে আসিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এখন এই অঘটন ও অনাচার সেই সকল হিতৈষীগণের চক্ষে নিদ্রা দুর্লভ এবং গাত্রদাহ দুঃসহ করিয়া তুলিল। তাঁহাদেরই অযাচিত অনুগ্রহে এই অসমঞ্জস বিবাহ ব্যাপার লইয়া একটা কুৎসিত জনরবের সৃষ্টি হইল। মহেশবাবুর এই বিবাহ নাকি সমস্তই ভুয়ো।, তিনি কোথা হইতে কোন ভদ্রঘরের কুলবধূকে বাহির করিয়া আনিয়া বিবাহিতা বনিতা বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, এইরূপ একটা কাণাঘুষা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া গেল। কিন্তু মহেশবাবু তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি সাধারণ হইতে কিছু বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। সেজন্য এ'জনরব সম্পূর্ণ অমূলক হইলেও তিনি স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোনই চেষ্টা করিলেন না। মনে করিলেই মহেশবাবু তাঁহার এই শাস্ত্র ও ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তাহারও আবশ্যকতা বুঝিলেন না। সমাজের ভ্রুকুটীতে ভয় না পাইয়া, লোকাপবাদ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি ধর্ম্মপত্নীর সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

বিবাহের দেড় বৎসর পরে তাঁহাদের একমাত্র সন্তান বেলার জন্ম

হয়। এই অপ্সরা শিশুর মত সুন্দর মেয়েটীকে পাইয়া তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনে সুখ ও আনন্দ শতধারে উছলিয়া উঠিল। কিন্তু বাল্যবিধবার অভিশপ্ত ভাগ্যে সে সুখ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। বেলার বয়স যখন মাত্র সাত বৎসর, তখন তাহার জননী প্রাণাধিকা দুহিতাকে স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া পরপারের সুদূর পথে অনির্দ্দেশ যাত্রা করিলেন।

এই আকস্মিক নিষ্ঠুর আঘাতে পরিণত-বয়স্ক মহেশবাবুর শরীর ও মন দুইই ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু অসহায় কন্যার মুখ চাহিয়া তিনি সে আঘাত সহ্য করিলেন, এবং অবসন্ন দেহমনে শক্তি সঞ্চার করিয়া, মাতৃ-হীনার সকল অভাব পূর্ণ করিয়া প্রাণপণ যত্নে মেয়েটীকে উপযুক্ত সুশিক্ষায় শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। বেলা বিবাহযোগ্যা হইলে মহেশবাবু কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য যখন একটী প্রকৃত সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন ঠিক তাঁহার আশানুরূপ না পাইলেও এমন একটী পাত্র মিলিল, যে তাঁহার কন্যার অনুপযুক্ত হইবে না।

মহেশবাবু বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, জীবিতাবস্থায় দুহিতাটীকে পাত্রস্থা করিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারেন, এই আশায় তিনি আর বিলম্ব না করিয়া বিবাহের দিনস্থির করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সে আশা তাঁহার পূর্ণ হইল না। অবিবেচক দুরন্ত কাল প্রবল জ্বররূপে দেখা দিয়া একদিনের মধ্যেই বেলার জীবনের ও সংসারের একমাত্র অবলম্বন পিতাকে চিরদিনের জন্যই বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া গেল। বেলা তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতেছিল, পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে তাহার জীবনের ধারা থিয়েটারের সিনের মত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে দুচক্ষে অন্ধকার দেখিল।

মহেশবাবুর চরিত্রগত দোষ কিছু না থাকিলেও তিনি মিতব্যয়ী কোনও দিনই ছিলেন না। তাঁহার যত্র আয় তত্র ব্যয় ছিল। বরং

বিবাহের পর, স্ত্রী-কন্যার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানার্থ তাঁহার উপার্জ্জনের অপেক্ষা খরচের পরিমাণ সময় সময় বেশীই হইয়া পড়িত। তাঁহার মৃত্যুর পর দেখা গেল, সঞ্চয় বিশেষ কিছুই নাই, অধিকন্তু বাড়ী কিনিবার সময় যে দেনা করিয়াছিলেন, তাহার কতক তখনও বাকি পড়িয়া আছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বেলার বাগ্‌দত্ত সেই সুপাত্রটি বিবাহে বীতস্পৃহ হইয়া একটা কারণ দর্শাইয়া বুদ্ধিমানের মত সরিয়া পড়িল।

বেলা তখন অনন্যোপায় হইয়া পিতার একমাত্র সুহৃদ্ অবিনাশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে তাহাদের দ্বিতল বাড়ীখানির মাত্র দুইখানি ঘর নিজের বসবাসের জন্য রাখিয়া অপরাংশ ভাড়ায় দিল এবং সেই ভাড়ার টাকায় পিতার অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিল। অবিনাশবাবু ও তাঁহার পুত্রবধূ জয়ন্তী দুইজনেই এই অনাথা মেয়েটীকে পরম স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাহাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন।

অবিনাশবাবুর বাসা বেলাদের বাড়ীর খুব কাছাকাছি ছিল, এমনকি ছাদ দিয়া দুইবাড়ীর মধ্যে অনায়াসে যাতায়াত করাও চলিত। মহেশ-বাবু মরণের কিছুকাল পূর্ব্বে নিজ সৌভাগ্যবলে এই একজন যথার্থ অকপট বন্ধু লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে অবিনাশ বাবুরও সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি একটা সরকারী অফিসে কাজ করিতেন। দুই বৎসর হইল পেন্সন লইয়াছেন। একটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া গৃহিণী বহুদিন বিগত হইয়াছেন। কন্যাটীর বিবাহ দিয়া তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া এবং উপার্জ্জনক্ষম প্রবাসী পুত্রের কাছে পুত্রবধূ এবং পৌত্র পৌত্রীদিগকে পাঠাইয়া দিয়া তিনি যখন সংসারের দেনা পাওনা চুকাইয়া নিশ্চিন্তমনে কাশীযাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময় নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতা বৃদ্ধের শিরে অতর্কিতে

দারুণ বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। কাল কলেরা রোগে স্বামীকে চিরদিনের জন্য হারাইয়া ভাগ্যহীনা জয়ন্তী তাহার নিরাশ্রয় অনাথ বালকবালিকা দুটীর হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, শোকার্ত্ত শ্বশুর মহাশয়ের চরণে আসিয়া আশ্রয় লইল। বৃদ্ধের কাশীবাস ঘুচিয়া গেল, অধিকন্তু পিতৃহীন অভাগা অপোগণ্ড দুটীর লালনপালন জন্য শোকজীর্ণ, বার্দ্ধক্যজীর্ণ ভগ্ন স্নেহমনে নূতন শক্তি সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার কাজে লাগিতে হইল। তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে এখনও একটা মার্চেণ্ট আফিসে সামান্য বেতনে চাকুরী করিতে হইতেছে। তথাপি বন্ধুকন্যা বেলাকে নিজ সংসারে রাখিবার জন্য অবিনাশ বাবু বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বেলা সম্মত হয় নাই। জ্যাঠামহাশয়ের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সে তাহার পিতৃগৃহেই বাস করিতে লাগিল। কিন্তু দিনের অধিকাংশ সময়ই সে জয়ন্তীর কাছে তাহার ছেলেমেয়ে দুটীকে লইয়া কাটাইত, রাত্রে তাহাদের ঘরেই শয়ন করিত।

পুত্রবধূর কাছে বেলার আন্তরিক অভিপ্রায় অবগত হইয়া অবিনাশ বাবু তাহার জন্য একটা টিউশনীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় বেলা তাহার পিতৃ-প্রভু চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা মায়ার শিক্ষকতায় নিয়োজিত হইল

পাঁচ

আষাঢ়ের ঘন গহন মেঘে সারাদিনই সমস্ত আকাশখানি আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বৈকালের দিকে আবার টিপি টিপি বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া সেই মেঘচ্ছায় বিমলিন বর্ষা অপরাহ্ণকে আরও নিরানন্দ এবং অস্বস্তি-জনক করিয়া তুলিয়াছে।

অরুণদের কলেজে সেদিন কোন্ এক 'টীমে'র প্রতিযোগিতায় 'হকি' ম্যাচ্ ছিল, সেইজন্যই সকাল সকাল ছুটীও হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতির এই দুর্য্যোগে খেলা হইয়া উঠিল না। সেজন্য পর্জ্জন্যদেবকে অভিসম্পাত করিতে করিতে কলেজ প্রত্যাগত অরুণ যখন তাহার নির্জ্জন কক্ষে গিয়া ঢুকিল, তখন তাহার মন সেই মেঘমেদুর বিষণ্ণ গগনের মতই নিরানন্দ হইয়া উঠিয়াছে।

এই বৃষ্টিতে বেড়াইবারও সুবিধা নাই, তাই সে অগত্যা কাপড় ছাড়িয়া একখানি বই লইয়া বসিল। কিন্তু পড়াও বেশীক্ষণ চলিল না।

বিমাতার সংস্রব হইতে দূরে থাকিবার জন্য বাহিরের দিকের একান্তে এই ঘরখানি অরুণ নিজেই পছন্দ করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু এই বাদল দিনের নিরালা নিঃসঙ্গতা আজ যেন তাহার বড় বিরক্তিকর ও অসহ্য বোধ হইতেছিল। অন্য দিন মায়া দাদার পথ চাহিয়া থাকে, কিন্তু আজ তাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। নিরুপায় হইয়া মায়াকে ডাকিতে অরুণ বাড়ীর ভিতর গেল। মায়ার পড়িবার ঘরের কাছাকাছি আসিয়া সে এস্রাজ ও কোমল নারীকণ্ঠের মিশ্রিত সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইল। অরুণ গীতবাদ্যের চিরদিনই একান্ত অনুরাগী, শুধু এই কারণেই সে একদিন সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিনী এক অভিনেত্রী-গৃহে পদার্পণ করিয়া বৃথা অপযশের ভাগী হইয়াছিল।

সেই দুর্জ্জয় মোহের আকর্ষণ অরুণ আজও কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। গতি ফিরাইতে না পারিয়া সে ধীরে ধীরে কখন নিঃশব্দে আসিয়া মুক্ত দ্বারপথে সূক্ষ্ম পরদার অন্তরালে দাঁড়াইল। ঘরের ভিতর মায়ার কাছে বসিয়া কে একজন অপরিচিতা তরুণী এস্রাজের মধুর নিক্কণের সহিত ততোধিক মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতেছিল—

"চিত্ত আমার হারাল আজ
মেঘের মাঝখানে,
কোথায় ছুটে চলেছে সে
কোথায় কে জানে।
বিজুলী তায় বীণার তারে
আঘাত করে বারে বারে,
বুকের মাঝে বজ্র বাজে
কি মহা তানে!"

শুনিতে শুনিতে অরুণ মন্ত্রমুগ্ধের মত সরিতে সরিতে কখন দ্বারের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা বুঝিতেই পারিল না। রঙীন্ পরদার অবকাশ-পথে সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সেই অপরূপ রূপসী তরুণী সোফার উপর, জানালার দিকে মুখ করিয়া এস্রাজ সহযোগে এই গানখানি গাহিতেছে। এস্রাজে ছড় দিবার সময় মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইয়া তাহার নিখুঁত সৌন্দর্য্য-ভরা সাবলীল দেহখানির অঙ্গে অঙ্গে অনাবিল সুষমা, অনুপম মাধুরী শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নাধারার মতই ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল।

তাহার ঘনকৃষ্ণ এলায়িত দীর্ঘ অলকদাম ও মেঘলা রংয়ের সাড়ীর লুণ্ঠিত অঞ্চলখানি গানের তালে তালে অধীর হইয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। জানালার দিকে ফিরানো থাকায় তরুণীর মুখখানি ভাল দেখা গেল না,

তথাপি অরুণ কিছুতেই সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। অরুণের মনে হইল যেন বরষারাণী আজ মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। সেই বীণা-নিন্দিত বিমোহন কণ্ঠ-স্বরে,—এস্রাজের সুরবাঁধা কম্পিত তারে, যেন তাহারই মধুভরা সজল বাদলরাগিণী বাজিয়া উঠিতেছিল। অরুণ নিশ্চল রুদ্ধশ্বাস হইয়া শুনিতে লাগিল তরুণী তন্ময় হইয়া গাহিতেছে।

"পুঞ্জে পুঞ্জে ভারে ভারে
নিবিড় নীল অন্ধকারে,
জড়ালরে অঙ্গ আমার
ছড়াল প্রাণে।
পাগল হাওয়া নৃত্যে মাতি,
হ'ল আমার সাথের সাথী,
অট্টহাসে ধায় কোথা সে
বারণ না মানে;
চিত্ত আমার হারাল আজ
মেঘের মাঝখানে।"

গানের শেষে একটা মৃদুমধুর ললিত ঝঙ্কার তুলিয়া এস্রাজ থামিয়া গেল। সুধাবর্ষী বীণাকণ্ঠ নীরব হইল। কিন্তু তাহার পরিত্যক্ত সুরের মিষ্ট রেশটুকু বিমুগ্ধ শ্রোতাকে যেন একটা স্বপ্নের মোহের মত তখনও আবিষ্ট আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। যখন মায়া গায়িকাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া প্রশংসমান কণ্ঠে কহিল, "আপনার কি চমৎকার গলা মিস্ রায়! সত্যি এমন গলা, এমন গান আমি কখনো শুনিনি।" তখন প্রচ্ছন্ন শ্রোতা অরুণও আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, তাহার প্রাণের উচ্ছ্বাস মুখ হইতে অতর্কিতে বাহির হইয়া গেল, "বাস্তবিক ধন্য—ধন্য আপনার শিক্ষা!"

সেই অপরিচিত কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া বেলা ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া দেখিল দ্বারে দাঁড়াইয়া এক স্কন্দপ্রতিম সুন্দর যুবক তাহার স্বপ্নালস ভরা মুগ্ধ নয়ন দুটী মেলিয়া তাহারই পানে চাহিয়া আছে। সে চক্ষে যেন পলকও পড়িতেছিল না! কি চমৎকার রূপ তার! কি মধুর কোমল সে দৃষ্টিটুকু! সেই সুগঠিত সুগৌর যৌবনপুষ্ট দেহখানিতে মাথম রংয়ের সিল্কের ঢিলা পাঞ্জাবীটা কি সুন্দর মানাইয়াছে! কৃষ্ণ কুঞ্চিত শিথিল কেশগুচ্ছগুলি সেই সপ্তমীর চাঁদের মত নির্ম্মল শুভ্র ললাটের উপর কেমন মধুর অলসভাবে লুটাইয়া পড়িয়াছে! কে এ যুবক? বেলা এ বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছে, প্রায় সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, কিন্তু এ শোভন মোহন মূর্ত্তি ত এ পর্য্যন্ত তাহার চক্ষে পড়ে নাই। সে মায়াদের গাড়ী করিয়া আসে, মায়াকে ঘণ্টা দুই শিক্ষা দিয়াই আবার সেই গাড়ীতেই ঘরে ফিরিয়া যায়। সুতরাং মায়া ও তাহার জননী ভিন্ন সে এ পরিবারের আর কাহারও খবর জানে না, জানিবার আবশ্যকতাও বোধ করে নাই।

আজ এই অপরিচিত যুবাপুরুষের সহসা আগমনে এবং তাহার আবেগ-উচ্ছ্বাসময় প্রশংসাবাণীতে বেলা লজ্জায় আরক্ত, সঙ্কোচে নত হইয়া এস্রাজ রাখিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভ্রাতার এই অতর্কিত আগমন এবং সেজন্য বেলার এই অপ্রতিভ বিপন্ন ভাব দেখিয়া বালিকা মায়া আমোদিত হইয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে প্রফুল্ল স্বরে বেলাকে বলিল, "ওকে দেখে এত লজ্জা করছেন কেন মিস্ রায়? উনি যে আমার দাদা!"

বেলার মুখে সহসা বাক্ ফুটিল না। সে আনত মুখখানি ঈষৎ তুলিয়া তাহার শ্বেতপদ্মের পাপড়ীর মত সুন্দর হাত দুখানি ললাটে ঠেকাইয়া সেই অপরিচিত ধনিসন্তানকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল। অরুণ

আরও এগাইয়া আসিয়া তরুণীকে প্রতিনমস্কার করিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিল, "মাপ করবেন, এরকম চোরের মত লুকিয়ে গান শোনাটা আমার বাস্তবিক উচিত হয় নি। কিন্তু কাজটা অন্যায় হলেও এতে আমার অপরাধ বিশেষ নেই বোধ হয়। আপনি যে সুরের মায়া ছড়িয়ে ছিলেন, কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারলুম না। আবার বলি মিস্ রায়, ধন্য আপনার শিক্ষা। সার্থক আপনার সাধনা! এমন মধুর কণ্ঠে, এমন তান লয় বিশুদ্ধ সঙ্গীত আমি আমার জীবনে বোধ হয় খুব কমই শুনেছি।"

মায়া দাদার কথায় সায় দিয়া সহর্ষে বলিল, "সত্যি দাদা! মিস্ রায় ভারি সুন্দর গান করেন, আর বাজনা—অর্গ্যান্, এস্রাজ, বাঁশী সবই নাকি বাজাতে পারেন। বসোনা দাদা! তুমি দাঁড়িয়ে থাক্‌বে কতক্ষণ? জানেন মিস্ রায়! আমার এ দাদাটী গান বাজনা শুনলে একেবারে পাগল হয়ে যান।"

অরুণ আসন গ্রহণ করিয়া বেলার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনিও বসুন।"

বেলা সঙ্কুচিত ভাবে মায়ার পাশে বসিয়া মেঘাচ্ছন্ন মলিন আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "মেঘ যেন আরো ঘনিয়ে আসছে, এই বেলা গাড়ীর জন্যে বলে দেবে মায়া?"

অরুণ সচকিত হইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "এরি মধ্যে যাবেন? আর একটুখানি বসুন না মিস্ রায়! আমাকে দেখে লজ্জা পেলেন বুঝি?"

বেলা বিনীত কোমল স্বরে উত্তর করিল, "না, এই বেলা বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। আকাশের যেমন গতিক, বৃষ্টি বোধ হয় আরো জোরে আসছে।"

কথাটা মিথ্যা নয়। ঘনায়মান মেঘের স্তরগুলি ক্রমশঃই ঘন

নিবিড়তর হইয়া আকাশখানিকে অন্ধকার থমথমে করিয়া তুলিতেছিল। দুর্য্যোগ আসন্ন। কিন্তু বেলার এই অধীরতা বাস্তবিক সেই দুর্য্যোগের জন্যই নহে, দ্রুতগামী মোটরকার তাহাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘরে পঁহুছাইয়া দিতে পারে, সেজন্য এতখানি ব্যস্ততা দেখাইবার কোনই কারণ ছিল না। আর ঘরে তাহার জন্য কেহ পথ চাহিয়া বসিয়াও ছিল না। কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত ধনিনন্দনের অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আবির্ভাব এবং তাহার উচ্ছ্বসিত মধুর প্রশংসাবাণী তাহাকে এতই কুণ্ঠিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে, সেই কন্দর্পকান্তি সুকুমার যুবকের বিমুগ্ধ দৃষ্টিটুকু সে যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। এ সঙ্কোচ, এ কুণ্ঠা যে কেন বেলা তাহা নিজেই বুঝিতে পারিল না।

বেলা ব্রাহ্মকন্যা, পিতার জীবিতকালে সে পুরুষ-সমাজে কতদিন অবাধে মেলামেশা করিয়াছে। কিন্তু কোনও পুরুষের সান্নিধ্য যে কোনও দিন তাহাকে এমন ভাবে লজ্জিত বা বিপন্ন করিতে পারিয়াছে, তাহা ত কই মনে পড়ে না। তবে এ দুর্ব্বলতা, এ সঙ্কোচ কিসের?

তাহাকে নীরব দেখিয়া অরুণ পরিতৃপ্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বাস্তবিক বড় সুখী হলুম মিস্ রায়! মায়ার মুখে আপনার সুখ্যাতি কদিন ধরেই শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আপনি যে এমন, তা কোনও দিন কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি। আমার কত বড় সৌভাগ্য—"

বেলার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইয়া, নিটোল গাল দুটীতে রক্ত করবীর গাঢ় লালিমা ফুটাইয়া উষ্ণ শোণিতের উচ্ছ্বাস কর্ণমূল পর্য্যন্ত রঞ্জিত করিয়া তুলিল। ইলেক্ট্রিক ফ্যানের নীচে থাকিয়াও সে এক গা ঘামিয়া উঠিল। ভদ্রতার অনুরোধে বেলা কোনও মতে সঙ্কোচের জড়তা কাটাইয়া সলজ্জ নম্র স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "ও কথা বলবেন না, আমি একজন সামান্যা স্ত্রীলোক মাত্র।"

"সামান্যা স্ত্রীলোক? না না, মিস্ রায়! ওটা শুধু আপনার বিনয়ের কথা। আপনি,—আপনি এ সংসারে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি!"

বেলার লজ্জারুণ সুন্দর মুখখানি অরুণের সেই আবেগ ভরা আন্তরিক প্রশংসায় দ্বিগুণ সঙ্কোচে আরও অবনমিত হইয়া পড়িল।

সেই সময় মায়া আসিয়া জানাইল, মোটর প্রস্তুত। বেলা যেন মুক্তির নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। অরুণ দুঃখিত অন্তরে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তা' হলে চল্লেন মিস্ রায়? আশা করেছিলুম, আপনার মধুর কণ্ঠের গান আর একটী শুনতে পাব।"

"মাপ করবেন, আজ আর কিছুতেই দেরী করতে পারছি না" বলিয়া অরুণকে একটী বিনীত নমস্কার করিয়া বেলা মায়ার সহিত চলিয়া গেল।

অরুণের মনে হইল, যেন বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত মাধুর্য্য সেই সৌন্দর্য্যপ্রতিমা বেলা তাহার সঙ্গে নিঃশেষে মুছিয়া লইয়া গেল। সেরূপ আর একবার দেখিবার জন্য অরুণ যখন বহ্নিমুখ পতঙ্গের মত গাড়ী বারান্দার দিকে ছুটিয়া আসিল, তখন দ্রুতগামী মোটর তন্বী বেলার কুসুম-সুকুমার দেহখানি আনন্দে বহন করিয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিল। অরুণ আজ যাহা দেখিল, যাহা শুনিল, সমস্ত অপূর্ব্ব ও অপ্রত্যাশিত। মহেশবাবুর কন্যাকে মায়ার শিক্ষকতায় নিযুক্ত করা হইয়াছে, এইটুকু সে জানিত; কিন্তু সে মেয়েটী যে এমন এক দর্শনীয় বস্তু, তাহা অরুণ কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই। বেলার অপ্সরোপম দুর্ল্লভ রূপরাশি এবং অমিয়বর্ষী সুমিষ্ট কিন্নর কণ্ঠ, তরুণবয়স্ক অরুণের নব জাগ্রত মোহময় যৌবনকে একটা নূতন মোহ, নূতন অনুভূতিতে আবিষ্ট সচকিত করিয়া তুলিল। অরুণের মনে হইতেছিল তাহার জীবন যৌবন আজ সব সার্থক হইয়া গিয়াছে।

বেলা চলিয়া যাইবার পরেই বৃষ্টি সত্য সত্যই আরো চাপিয়া আসিল। অরুণ আজ সান্ধ্যভ্রমণে গেল না, যাইতে বড় একটা ইচ্ছাও তাহার ছিল না। এ দুর্য্যোগে বন্ধুবান্ধবেরাও কেহ আসিলেন না। অরুণ আজ যেন তাহা সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করিল। সে সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া লইয়া অসময়ে শয্যা গ্রহণ করিল। ঘুমাইবার জন্য নহে, আজিকার অভাবিতরূপে পাওয়া নূতন অনাস্বাদিত পুলক-রসটুকু নিভৃতে নিশ্চিন্তে উপভোগ করিবার জন্য।

অরুণ সেই অদৃষ্টপূর্ব্বা রূপময়ী তরুণীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিল। বিজলীর ক্ষণিক চকিত দীপ্তি কক্ষ-বাতায়নের সবুজ নীল সার্শীগুলিতে স্নিগ্ধতা লাভ করিয়া, ধ্যানমগ্ন অরুণের চক্ষে যেন সেই রূপসীর ক্ষণদৃষ্ট রূপপ্রভার মতই ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাত হইয়া তাহার সুরভরা মরম বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া যাইতেছিল। ঝম্ ঝম্ ঝরিয়া-পড়া অশ্রান্ত বাদলধারার মধুভরা করুণ রাগিণীতে বাজিতেছিল, সেই প্রাণ-মাতানো মধুর সুর, সেই জগৎ-বন্দিত কবির চিত্ত হারানো মধুর গান—

"চিত্ত আমার হারাল আজ
মেঘের মাঝখানে,
কোথায় ছুটে চলেছে সে
কোথায়, কে জানে।

ছয়

পরদিন অরুণ সেই শুভ মুহূর্ত্তটুকুর জন্য সারা দিনমান ব্যাকুল, উন্মুখ হইয়া রহিল, এবং প্রাণের মধ্যে একটা অদমনীয় তৃষা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া সে আজ আরো সকাল করিয়া কলেজ হইতে চলিয়া আসিল। আসিয়াই মায়ার ঘরের দিকে গেল। কিন্তু সে ঘর আজ শূন্য, অরুণের সেই চিত্তহারিণীর সাক্ষাৎ আজ আর মিলিল না। তবে কি বেলা আজ আসে নাই? আসিয়াছিল, কিন্তু মায়ার শিক্ষার স্থান আজ গৃহিনীর খাস কাম্‌রায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কল্যকার ব্যাপার কন্যার মুখে অবগত হইয়া বুদ্ধিমতী অনুপমা সতর্কতা অবলম্বনের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ক্ষুণ্ণমনে, দুঃখিত অন্তরে অরুণ নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। কিন্তু খানিক পরে মোটরখানা যখন বেলাকে লইয়া যাইবার জন্য গর্জ্জন করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত গাড়ীবারান্দায় উপস্থিত হইল, তখন অরুণ আর কিছুতেই ঘরের ভিতর থাকিতে পারিল না। বেলাকে একটি বার চক্ষের দেখা দেখিতে সে ক্ষুব্ধ লালায়িত চিত্তে সেইদিকে চলিয়া আসিল।

বেলা গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, সেই সময় সহসা দেখিতে পাইল, বারান্দার সবুজ লতায় ঘেরা জোড়া থামের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছে অরুণ। অরুণের অনিমেষ নয়নের তৃষিত দৃষ্টি তাহারই পানে দৃঢ় নিবদ্ধ।

বেলা লজ্জিত, স্মিতমুখে একটী ছোট্ট নমস্কার জ্ঞাপন করিয়া তাড়াতাড়ি মোটরে উঠিয়া পড়িল। এই ব্যাপার এখন নিত্যই ঘটিতে লাগিল। বেশী কিছু নয়, শুধু একটুকু সরস চকিত মধুর চাহনি, আর

গোলাপী ঠোঁটের কোণে লাগিয়া থাকা নীরব সুধাময় হাসিটুকু, সে হাসি লজ্জার কি সুখের তাহাও বোঝা যায় না, কিন্তু সেইটুকুর জন্যই ভাগ্যবানের দুলাল অরুণ সারাক্ষণ ব্যাকুল, উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। আর বেলা! অরুণের সুকুমার দেবোপম কান্তি, আর তাহার সেই পুলক-পূরিত প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস, মুগ্ধ আঁখি দুটির অনুরাগভরা তৃষাকুল দৃষ্টি, তরুণী বেলার অনবদ্য শুভ্র কুমারী হৃদয়ে কি একটুও রেখাপাত করে নাই? করিয়াছিল বই কি,—বড় গভীরভাবেই করিয়াছিল। বেলা তাহার অতুলনীয় রূপের স্তুতি কতবার কত পুরুষের মুখে শুনিয়াছে, কিন্তু সে স্তুতিবচন তাহার কোমল তরুণ চিত্তখানিকে এমনভাবে উদ্‌ভ্রান্ত আকুল করিয়া তুলে নাই তো; পুরুষ পরশমণি—জয়ন্তীর একথাটী বেলা সেদিন হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার যথার্থতা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল।

পরশমণির সেই অতটুকু সরলস্পর্শ প্রেমের স্বর্ণতুলিকা বুলাইয়া তাহার সমস্ত অন্তরখানিকে গোপনে গোপনে কখন রাঙাইয়া তুলিয়াছিল তাহা সে জানিতেও পারে নাই, কিন্তু একটা অজ্ঞাত সুখ ও সার্থকতায় ভরিয়া গিয়া বেলার মনে হইতেছিল তাহার নিরবলম্ব নিঃসঙ্গ কুমারীজীবনে সে যেন এক নূতন গৌরব, নূতন সম্পদ লাভ করিয়াছে।

তাহার বিকশোন্মুখ চিত্ত-শতদল, এখন নব বসন্তের মদির সমীর স্পর্শে নব জাগ্রত পুষ্পদলের মত, সৌরভে গৌরবে ভরপুর হইয়া, যেন কোন্ অনাগত জীবনদেবতার চরণ পরশের আশায় কেবলই ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। এ অধীরতা, এ ব্যাকুলতা যে কিসের বেলা তাহা কতক অনুভব করিতে পারিতেছিল, কিন্তু সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না তাহার মনের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সুখের না দুঃখের? অরুণ কি সত্যই তাহার প্রতি আকৃষ্ট? কিন্তু নির্দ্দয় বিধাতা

যে তাহাদের দুই জনের মিলনপথে আকাশ প্রমাণ ব্যবধান তুলিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমতঃ তাহারা দুইজন দুই বিভিন্ন সমাজের লোক, দ্বিতীয়তঃ অরুণ একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত বংশের বংশধর, আর সে সামান্য গৃহস্থকন্যা, তাহার উপর মন্দভাগিনী বেলার দুঃখময় জীবনের সহিত যে একটা মিথ্যা কলঙ্ক জড়িত হইয়া আছে, তাহাও তো অগ্রাহ্য করিবার বিষয় নহে! তবে এ দুরাশা. এ পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের সাধ কেন? এ 'কেন'র উত্তর সেই বিশ্ববিজয়ী প্রেমের দেবতাই বলিতে পারেন। তিনি তো অতশত ভাবিয়া পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া নরনারীর হৃদয়ের সন্ধান করেন না! তাঁহার শাসন জীবমাত্রকে মানিতেই হইবে। জীবনে ভালবাসার এই শুভ মুহূর্ত্তটী আসিলে ভালো তাহাকে বাসিতেই হইবে। বসন্তের উতলা রঙীন্ বাতাসে ফুলকলিকে সুবাস বিলাইবার জন্য ফুটিতেই হইবে। বিশ্ববিধাতার এই চিরন্তন নিয়ম যে অলঙ্ঘনীয়।

তাই দিনান্তের সেই একটীবার দেখা, আর এক নিমেষের জন্য চারি চক্ষুর দৃষ্টি বিনিময়, তাহাতেই সেই তরুণ দুটী প্রাণের প্রচ্ছন্ন অনুরাগ দিনে দিনে বৰ্দ্ধিত, এবং স্বল্প পরিচিত প্রেমভরা হৃদয় দুখানি, ধীরে ধীরে পরস্পর আকৃষ্ট ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। মনে মনে কল্পনার জাল বুনিয়া দুইজনেই যখন প্রেমের মোহময় মধুর স্বপ্নে তন্ময়—বিভোর হইয়া পড়িতেছিল, তখন সে স্বপ্ন একদিন অতর্কিতে ভাঙ্গিয়া গেল। অরুণ শুনিল এক ধনাঢ্য জমীদার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছে এবং পাত্রীটী যথার্থই সুন্দরী, সুতরাং এ বিবাহে অরুণের আপত্তি তুলিবার কিছুই কারণ নাই। পাত্রপাত্রীর কোষ্ঠী মিলিলেই এখন সম্বন্ধটি পাকা হইয়া যায়। মায়ার মুখে বেলাও একথাটা শুনিল। এ সংবাদ তাহাকে যে কতখানি ব্যথা দিল, তাহা সেই অন্তর্যামীই বলিতে পারেন। কিন্তু এ দুঃখ, এ ব্যথার অনুভূতি যে কিসের, তাহা সে বুঝিতে

পারিল না। যাহার সহিত শুধু দিনান্তে একবার চোখের দেখার সম্বন্ধ, সে বিবাহিত হইলেই বা বেলার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? এ বিবাহ ঘটিলে সেই পরম সৌভাগ্যবতী রমণী, সেই সুন্দরী জমীদার-নন্দিনী তাহার এই ক্ষণিকের সুখটুকু হরণ করিয়া এই চক্ষে দেখার সাধেও কি বাদ সাধিবেন? সুন্দরী তরুণী পত্নীর রূপে ও প্রেমে তৃপ্ত অরুণ কি তখনও এমনি পুলকোজ্জ্বল মুখ ও পিপাসিত আকুল আঁখি দুটী লইয়া তাহাকে একটিবারও দেখা দিতে ছুটিয়া আসিবে? না, না, এ যে অসম্ভব। এ মরীচিকার মায়া এখন তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে।

অরুণ এই আসন্ন বিপত্তির সম্ভাবনায় বিলক্ষণ চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইল। বেলার রূপে, বেলার প্রেমের স্বপ্নে তাহার অন্তর তখন পরিপূর্ণ, সেখানে অন্য কোনও নারীকে কোনও দিনই স্থান সে দিতে পারিবে না, তবে বিবাহ করিয়া আর একটি জীবনকে অসুখী ব্যর্থ করিবে কেন? এই যে বেলা,—তন্বী, সুন্দরী, তরুণী বেলা, অরুণরাগরঞ্জিত প্রস্ফুট প্রভাত পদ্মের মত যাহার সৌন্দর্য্য, শরতের অনাবিল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাটুকুর মতই যাহার মাধুর্য্য, যাহার মধুবর্ষী কোকিলকণ্ঠ, এই দুঃখময় মর্ত্ত্যভূমে মুহূর্ত্তে আনন্দের নন্দনকানন রচনা করিতে পারে, সেই রূপের রাণী, সর্ব্বগুণান্বিতা বেলাকে অরুণ মনে করিলে কি জীবনের চিরসঙ্গিনী করিতে পারে না? কেন পারিবে না? সমাজ? সমাজের ভ্রুকুটী সে গ্রাহ্যও করে না, তবে পিতা—এই খানটীতে আসিয়াই অরুণের চিন্তাসূত্র জট পাকাইয়া গেল। তথাপি সে মনে মনে স্থির করিল একবার যেরূপে যেমন করিয়া হ'ক, বেলার সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মনোগত অভিলাষ জানিবে। তাহার পর বেলা যদি তাহাকে বরণ করিতে সম্মত থাকে তবে পিতার চরণে ধরিয়া তাঁহার অনুমতি বা মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিয়া লইবে।

সংকল্প স্থির করিয়া অরুণ সুযোগ খুঁজিতে লাগিল এবং সে সুযোগ ভগবান দয়া করিয়া শীঘ্রই মিলাইয়া দিলেন। সেদিন অনুপমা তাঁহার এক বান্ধবীগৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, বৈকালের পূর্ব্বেই সেখানে পঁহুছিতে হইবে। সেজন্য মায়া আজ তাহার শিক্ষয়িত্রীর কাছে সকাল করিয়া ছুটী লইল এবং গৃহিণী বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য নিধিরামের উপর একখানা ভাড়াটে গাড়ীতে বেলাকে তাহার বাড়ী পঁহুছাইয়া দিবার ভার দিয়া কন্যাসহ মোটরে করিয়া চলিয়া গেলেন। শনিবার উপলক্ষে কলেজেও সকাল সকাল ছুটী হইয়াছিল, সুতরাং অরুণ এ দেবদত্ত শুভ মুহূর্ত্ত প্রত্যাখ্যান করিল না। বেলা যখন গাড়ীর অপেক্ষায় বারান্দায় একাকিনী দাঁড়াইয়াছিল, তখন সে ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বলিল, "মিস্ রায়! যাবার আগে আপনি আমার একটা কথা শুনতে পারবেন কি?" বিস্মিতা বেলা অরুণের অভাবিত আগমন ও সাগ্রহ প্রশ্নে সচকিত হইয়া উঠিল। সে তাহার বিস্ময়াকুল কৌতুহলী চক্ষু দুটী তুলিয়া অরুণের পানে সঙ্কোচে চাহিয়া রহিল। অরুণ সতর্কতার সহিত মৃদু কোমল স্বরে বলিল, "যদি শোনেন তাহ'লে দয়া করে' একবার এধারে নিরিবিলিতে আসুন।"

অরুণের মুখ চক্ষের ভাব, এবং কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া একটা লজ্জানিত সুখে—কি আশঙ্কায় ঠিক বলা যায় না, বেলার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। সে ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া অরুণের সঙ্গে বারান্দার অন্য প্রান্তে অপেক্ষাকৃত নিভৃত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। অরুণ কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, "আমার বিবাহের সব ঠিক করা হচ্ছে, একথা হয়তো আপনিও শুনেছেন মিস্ রায়?"

বেলা নীরবে ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া "হাঁ" বলিল।

"কিন্তু বিবাহ আমি করব না, করতে পারব না।"

বেলা অরুণের কথায় একটু শঙ্কিত হইয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? পাত্রী আপনার পছন্দসই নয় বুঝি?"

"না, শুধু এ পাত্রীই নয়, পৃথিবীর কোনও মেয়েকেই বোধ হয় আমি স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারব না।"

"কারণ?"

বেলা তাহার বিস্ময়ভরা প্রশান্ত চক্ষু দুটী অরুণের পানে তুলিতেই সে তাহার অদমনীয় হৃদয়াবেগ আর রোধ করিতে না পারিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কারণ বল্‌ব তবে? আজ কত কষ্টে, কত সাধনায় এই বল্‌বার সুযোগ পেয়েছি যখন, তখন কথাটা আর চেপে না রেখে বলে ফেলাই ভাল। এ সুযোগ হয়তো আর পাব না। মিস্ রায়! বেলা! আমার আজকের এই ধৃষ্টতা দেখে তুমি বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছ, কিন্তু কি করি, এ যাতনা যে ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে, আমার জীবন যে দিন দিন দুর্ব্বহ হয়ে পড়ছে—"

বেলার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। অরুণের সেই কথাগুলির মধ্যে ভাব ও আবেগের আধিক্য এত বেশী ছিল যে বেলা ভয় পাইয়া শশব্যস্তে কহিল, "আস্তে বলুন অরুণ বাবু! অধীর হবেন না। আমি যে আপনার কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পারছি না, ভগবান্ তো আপনাকে সর্ব্ব সুখের অধিকারী করেছেন, তবে আপনার জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠছে কেন?"

অরুণ মৃদু কম্পিতকণ্ঠে কাতরভাবে উত্তর করিল "কেন? তাও কি আবার বলে জানাতে হবে বেলা? তবে শোন, আমি তোমার কাছে আজ কৃপার ভিখারী, তোমার দয়া না পেলে আমার সমস্ত জীবনটাই নিষ্ফল ব্যর্থ হয়ে যাবে। তোমাকে যে আমি কি চক্ষে দেখেছি বেলা! আমার ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা, স্বপ্ন সমস্তই এখন তুমি! বল বেলা! তুমি তোমার কৃপাপ্রার্থীকে করুণায় বঞ্চিত করবে না।"

বেলার আপাদ মস্তক শিহরিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিল। অরুণ আজ বলে কি? সে তাহার কৃপাপ্রার্থী, দয়ার ভিখারী, এসব কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি তাহা বেলা ঠিক বুঝিতে পারিল না। বিলাসী ধনীপুত্রের প্রজ্বলিত লালসাগ্নিতে তাহার রূপ-যৌবন আহুতি দিবার জন্যই কি এই সাদর আমন্ত্রণ? বেলাকে অনাথা অসহায়া পাইয়া রূপের পিয়াসী যুবক, তাহাকে নিজ বিলাসসঙ্গিনী করিয়া যৌবনের অদম্য কামনা ও রূপতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে চাহে নাকি? অরুণের সান্নিধ্য হইতে ত্রস্তে একটুখানি সরিয়া গিয়া বেলা ব্যথিত চিত্তে ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "আপনি আমার কৃপাপ্রার্থী? ছিছি! এসব লজ্জার কথা বলে আপনি আমাকে অপরাধিনী কেন করছেন অরুণ বাবু? আমি গরীব, আপনাদের আশ্রিতা তাই কি আমাকে এতটা হীন মনে করেছেন? আমাকে আপনি"—বেলা কথাটা শেষ করিতে পারিল না, লজ্জায় ঘৃণায় সঙ্কোচে তাহার জিহ্বা যেন জড়াইয়া আসিল।

তাহার কথা ও কথা বলিবার ভঙ্গীতে অরুণ, চমৎকৃত হইয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "আমার ধর্ম্মপত্নী হওয়া কি তুমি এতই হীনতার বিষয় মনে কর বেলা? যদিও রূপে গুণে কিছুতেই আমি তোমার সমযোগ্য নই, কিন্তু আমার প্রাণঢালা ভালবাসা দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে আমি তোমাকে সুখী করতে চেষ্টা করব। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই বেলা!"

বেলা আজ একি শুনিল? সেকি স্বপ্ন দেখিতেছে? এই পরম রূপবান্ পরম সৌভাগ্যবান্ ধনীর দুলাল তাহাকে যাচিয়া সাধিয়া ধর্ম্ম-পত্নীত্বে বরণ করিতে উৎসুক একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? বেলার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সর্ব্ব শরীরের শিরা উপশিরায় চঞ্চল উষ্ণ শোণিতোচ্ছ্বাস দ্রুততালে নৃত্য বাঁধাইয়া দিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার এই উত্তেজনা,

এই অপ্রত্যাশিত পুলকাবেগ সংযত, দমিত করিয়া দিয়া বেলার মনে পড়িল তাহাদের এই অভীপ্সিত মিলন পথের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের কথা। ওগো! বেলার অন্তরের দেবতা! তুমি জানিয়া শুনিয়া এই দারুণ দুরাশাকে মনে কেন স্থান দিলে? তোমার এ ভালবাসার প্রতিদানে বেলা যে তোমার চরণে এখনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহার লাঞ্ছিত দুর্ভাগ্য জীবনের সহিত প্রণয়াস্পদকে জড়িত করিয়া তাঁহার আশাপূর্ণ গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ব্যর্থ নষ্ট করিয়া দিবে সে কোন্ প্রাণে? সে যে নারী,—দুঃখিনী ভাগ্যহীনা হইলেও যে ভগবান্ তাহাকে নারীর হৃদয় দিয়াই গঠিত করিয়াছেন! স্বার্থের অনুরোধে সে তাহার পবিত্র নারীত্বকে পঙ্কিল আবিল করিবে কেমন করিয়া?

এই আশা-নিরাশা, হর্ষ-বিষাদের মাঝে পড়িয়া বেলার বাক্য নিঃসরণের শক্তি যেন রহিত হইয়া গেল। সে বিপর্য্যস্ত চিত্তে বারান্দার থাম ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার এই মৌনভাবে অরুণ অধৈর্য্য হইয়া আকুলস্বরে বলিল, "আর সময় নেই, এখনি হয়তো গাড়ী এসে পড়বে, তুমি দয়া করে আমার কথার উত্তর দাও বেলা! বলো, তুমি কি আমার হবে না? আমি যে আজ বড় আশা করে' তোমার কাছে এসেছি বেলা!"

অবসন্ন হৃদয়ে শক্তি সংগ্রহ করিয়া বেলা কাতরকণ্ঠে করুণসুরে বলিল, "আপনি বিদ্বান, জ্ঞানবান হয়ে এ দুরাশাকে কেন মনে স্থান দিলেন অরুণ বাবু? আপনি কি জানেন না, আমাদের দুজনের মাঝখানে কত বড় বাধা, কি প্রকাণ্ড ব্যবধান মাথা তুলে রয়েছে?"

"কিসের বাধা, কিসের ব্যবধান বেলা? সমাজ আর অবস্থার পার্থক্য? কিন্তু তুমি যদি আমার হও, তাহলে যে আমি পৃথিবীর আর কোনও কিছুই চাই না বেলা! তোমাকে নিয়ে আমি ভিন্ন সমাজ, স্বতন্ত্র জগৎ

রচনা করব, সেখানে শুধু তুমি আর আমি থাক্‌ব,—আমাদের সকল ব্যথা, সকল অভাব পরস্পরের বুকভরা নিবিড় স্নেহপ্রেম দিয়ে নিবারিত হবে—পারবে না বেলা! এরকম করে' থাক্‌তে ?"

"কিন্তু, আমার দুরদৃষ্টের আর এক নিগ্রহের কথা আপনি জানেন না বোধ হয়, একটা যে ঘৃণিত লজ্জাজনক অপবাদ—" "জানি, কিন্তু সে অপবাদ যথার্থ হলেও আমি তোমায় পাবার আশা ছাড়তে পারতুম না বেলা! তোমাকে না পেলে যে আমার এখন বেঁচে থাকাই ভার হবে!"

সে কথায় সে স্বরে একটা অব্যক্ত ব্যথায় বেলার চক্ষের পাতা ভিজিয়া উঠিল। সে আর্দ্র করুণকণ্ঠে বলিল, "এবিষয় ভাল করে ভেবে দেখুন অরুণ বাবু! আপনার পিতা মাতা আত্মীয় পরিজন সকলেই আছেন, আপনি তো স্বাধীন নন্ যে—" এই সময় গাড়ীর শব্দ শোনা গেল।

অরুণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সে সব আমি বুঝব, তুমি শুধু বলো, এ প্রস্তাবে তোমার নিজের কোন আপত্তি নেই তো ?"

বেলা সে কথার উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছিল না। ওদিকে গাড়ী আসিয়া পড়িল। অরুণ অধীর হইয়া বলিল, "আমার কথার একটা উত্তর দিয়ে যাও বেলা!"

"উত্তর দেব ? আপনি যে অসম্ভব কথা বলছেন অরুণ বাবু!"

বেলা গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল, অরুণ বাধা দিয়া বিভ্রান্ত ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "একটু থামো! সম্ভব অসম্ভবের কথা আমি তো বলছিনা, আমি শুধু জান্‌তে চাই তোমার মনের কথা।"

"আমার মনের কথা চিরদিন অপ্রকাশ থাকাই ভাল। এখন দয়া করে' আপনি এ দুরাশা ত্যাগ করুন অরুণ বাবু! আমার শুধু এই

মিনতি" বলিতে বলিতে বিপর্য্যস্ত ব্যাকুল দেহ মন লইয়া বেলা গাড়ীর মধ্যে আশ্রয়. লইল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়া বেলা দেখিতে পাইল অরুণ তখনও সেই খানটীতে দাঁড়াইয়া তৃষাকাতর অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া বেলার নীলোৎপল-নয়ন ছুটী হইতে আনন্দ ও ব্যথার অশ্রুবারি হেমন্তের শুভ্র স্বচ্ছ শিশির বিন্দুর মতই ঝর ঝর ঝরিয়া পড়িল। সে সারাপথ ভাবিতে ভাবিতে চলিল, তাহার এই আকাশকুসুমের সুখস্বপ্ন বিধাতা কি সত্যই সফল করিবেন? ভাগ্যবিড়ম্বিতার ভাগ্যে এত সুখ, এত সৌভাগ্য কি সত্যই সম্ভব হইতে পারে?

সাত

"হ্যাঁরে মায়া ! অরুণ এতক্ষণ তোর সঙ্গে কি ফুস্ ফুস্ করে' বলছিল ?"

"কই ? কখন ?—" "আহা ! এরি মধ্যে ভুলে গেলি ?—নেকি আর কি ? এই যখন বামাকে দিয়ে তোকে ভাত খাবার জন্যে ডেকে পাঠালুম।"

"ওঃ ! সে একটা কথা ছিল।" "কি কথা তাই বল্না ? ওরকম গুজুর গুজুর, ফুসুর ফুসুর আমি ভালবাসি না বাপু ! এযে সবই বাড়াবাড়ি দেখি", মাতার কথার ঝাঁজে মায়া ভয় পাইয়া বলিল, "বলছি মা ! বলছি, কিন্তু আগে বল, সেকথা শুনে তুমি দাদার ওপর রাগ করবে না ?"

গৃহিণী দ্বিগুণ বিরক্ত হইয়া তিক্তকণ্ঠে কহিলেন, "নাঃ ! এ মেয়েকে নিয়ে তো ভারি মুস্কিলে পড়ে গেলুম ! দিনরাত দাদা দাদা করেই গেলেন একেবারে ! ঐ দাদাই তোমার মাথাটী ভাল করে' খাবে দেখছি ! এতটুকু মেয়ের কাছে এসব লাগানি ভাঙ্গানি—"

বাধা দিয়া মায়া শশব্যস্তে কহিল, "না মা ! ওসব কিছুই নয়। দাদা ওরকম কোনও কথা আমাকে কোনও দিন বলে না, তুমি খামোখাই তাকে দোষ দাও।" "বেশ, এখন সেই নির্দ্দোষী দাদাটী তোমায় কি ফুস্ মন্তর দিচ্ছিলেন তা শুনি ?" মায়া একটু কুণ্ঠিতস্বরে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলিল, "দাদা কি বল্ছিল জানো মা ? বল্ছিল এখন সে বিয়ে করবে না, বিয়ে করতে পারবে না।" "কেন ? অপরাধ ?—" "তাতো জানি না, তবে দাদা বল্লে, যদি তোমরা তার মানা না শুনে জোর করে বিয়ে দিতে যাও, তা'হলে সে লেখাপড়া সব ছেড়ে ছুড়ে কোথাও চলে যাবে।"

কথাটা বলিবার সময় মায়ার চক্ষু দুটী আপনা আপনি ছল ছল করিয়া আসিল। অনুপমার মুখ গম্ভীর হইল। ক্ষণকাল কি ভাবিয়া তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে মায়া! সত্যি করে বল্ দেখি, সেই সেদিনের গান শোনার পর অরুণ কি মহেশবাবুর মেয়ের সঙ্গে আর কোনও দিন দেখা সাক্ষাৎ করে নি?" "না মা! কি করে' দেখা করবে? বেলা দি' তোমার সামনেই আসে, আবার তোমার সামনেই চলে যায়,—এর মধ্যে কখন—" "আহা! আমি তো তাকে সর্ব্বক্ষণ আগ্‌লে থাকি না? বাইরে যখন যায়—" "তখনো তো আমি তার সঙ্গে থাকি মা! বেলা দি' যতক্ষণ না গাড়ীতে ওঠে, ততক্ষণ তো আমি তার কাছে কাছেই থাকি।"

"তবে যে বামা বল্‌ছিল—" "কি বলছিল?" "বেলা যখন যায়, ঠিক সেই সময়টি বুঝে অরুণ গাড়ীবারান্দার কাছে কাছে ঘোরে, তাকি তুই দেখতে পাস্ না?" মায়ার এবার মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার শিক্ষয়িত্রী বেলার সহিত অরুণের দেখা সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ যে কেন, বালিকা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, তবে তাহার জননী যে এবিষয়ে কিরূপ সতর্ক ও খড়্গহস্ত তাহা সে ভালমতেই জানিত। তাই এক্ষেত্রে সত্য কথাটা বলিতে মায়ার সাহসে কুলাইতেছিল না। সে মাতার প্রশ্নে ম্লান কুণ্ঠিত মুখে বলিল, "না মা! আমি তো কই দেখিনি।"

কিন্তু কন্যার সেই অপরাধীর মত মুখভাব দেখিয়া সে যে সত্য গোপন করিতেছে, অনুপমা তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। তিনি মেয়েকে ধমক দিয়া উঠিলেন, "ফের মিথ্যা কথা? তুই ঠিক বলছিস দেখিস্ নি? অ্যাঁ?"

মায়ের সেই কঠিন জেরায় পড়িয়া বেচারী মায়া ঘাবড়াইয়া গেল। থতমত খাইয়া সে কাঁদকাঁদ মুখে বলিয়া ফেলিল, "দেখেছি,—কিন্তু রোজ তো নয়। এক আধ দিন, তাও দাদাতো বেলা দি'র কাছেও

আসে না, তার সঙ্গে কথাও কয় না, শুধু দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখে, তাতে আর কি হয়েছে ?" "না কিছু হয়নি, আচ্ছা তুই যা এখন খেলা করগে ।"

মায়ের হাতে অব্যাহতি পাইয়া মায়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

অনুপমা গম্ভীরভাবে আপন মনেই বলিলেন, "হুঁ ! বুঝেছি, আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে এমনি করে' ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে ? তাইতো বলি, ছেলের হঠাৎ ঘরপানে এত টান হল কেন ? ছুটী হতে না হতে সুবোধ ছেলেটীর মতন ঘরে ফিরে আসা ! আর শুধুই কি ঐ চক্ষের দেখা, ভেতরে ভেতরে আরো না জানি কত লীলাই চলছে ! কর্ত্তা মনে করেন আমার ছেলেটী নির্দ্দোষী, নিরপরাধ, এখন ছেলে যে কি কীর্ত্তি করে বসেছে তা দেখুন একবার।" অনুপমা তাহার জীবনে ভালমন্দ বিস্তর উপন্যাস পাঠ করিয়াছিলেন, তাই এই পূর্ব্বরাগঘটিত প্রণয় ব্যাপার বুঝিতে তাঁহার আদৌ বিলম্ব হইল না। সপত্নীপুত্রের এই আশ্চর্য্য দুঃসাহস ও হীন প্রবৃত্তিকে ধিক্কার দান করিয়া তিনি যখন নিজের মনেই গজ্‌রাইতেছিলেন, তখন স্বয়ং কর্ত্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন। নীল রংয়ের একটা কাগজের মোড়ক গৃহিণীর হাতে দিয়া তিনি বলিলেন, "ওগো ! দেখ দেখি জিনিসটা কেমন হল ?" অনুপমা অনাগ্রহের ভাবে মোড়ক খুলিয়া নূতন প্যাটার্ণের স্বর্ণহারছড়াটীর উজ্জ্বল চুণী ও পান্না বসানো বাহারে ফুলগুলি দেখিতে লাগিলেন। চৌধুরীমহাশয় প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "বেশ গড়েছে না ? রাধু বড় কারিকর লোক। তুমি লাভচাঁদের ক্যাটালগ থেকে যেমন নমুনাটী দিয়েছিলে যেন হুবহু সেই প্যাটার্ণ বসিয়ে দিয়েছে।" গৃহিণী মুখখানা অসম্ভব ভার করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, কিন্তু গয়না গাঁটি আর গড়িয়ে কি হবে ?" চৌধুরীমহাশয় সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, "কেন গো ?

বউমাকে, আমাদের অরুণের বউকে দিতে হবে না? বাপের বাড়ী থেকে গহনা পত্র যত দিক, দুচার খানা এখান থেকে না দিলে ভাল দেখাবে কেন?" "সে ত বুঝলুম, কিন্তু বিয়ে হলে তবেই ত বউ আসবে!" চৌধুরীমহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, "ও কি কথা? বিয়ে হবে না কেন? তবে এসব উদ্যোগ আয়োজন করছি কিসের জন্যে? ঠিকুজী কোষ্ঠী সব মিলে গেছে, কেবল দিন স্থির করতে বাকি, ওবেলা পুরুত ঠাকুরকে ডেকে তা'ও করে' নেওয়া যাবে।"

অনুপমা অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, "সবইতো করছ, আর করবে, কিন্তু ওদিকে তোমার ছেলে যে বেঁকে বসেছে, বলছে এ বিয়ে সে কখনই করতে পারবে না, জোরজবরদস্তি করলে পালিয়ে যাবে।"

কর্ত্তা সে কথায় যেন আকাশ হইতে পড়িয়া শশব্যস্তে বলিলেন, "সে আবার কি? একথা কি অরু তোমাকে নিজেই বলেছে নাকি?" "না, নিজে বলবে কোন্ মুখে? মায়ার কাছে শুনলুম।"

চৌধুরীমহাশয় একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তাই ত! কিন্তু আমার বোধ হয় এসব ছেলেমানষি ভিন্ন আর কিছুই নয়। মেয়ে সুন্দরী, ডাগর —তবে এ বিয়েতে আপত্তি করবার কারণ কি? তুমি কি রকম বুঝছো অনু?"

অনুপমা ঠোঁট বাঁকাইয়া একটা যেন কিছু গোপন রাখিবার ভঙ্গীতে কহিলেন, "কি জানি বাপু! কারুর মনের কথা আমি কি করে' বুঝব? তবে বোধ হয়—"

গৃহিণীকে কথার মাঝখানে থামিতে দেখিয়া চৌধুরীমহাশয় সোৎসুকে জিজ্ঞাসিলেন, "তবে কি? আমার পছন্দর উপর বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না? তা আমি তো প্রথমেই বলেছিলুম, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সে একবার নিজেই গিয়ে দেখে আসুক, সে মেয়ে ত অপছন্দ করবার মতন

নয়।" "তা গেলেই তো হ'ত, কিন্তু এখন গতিক যে রকম দেখছি, শুধু এই মেয়ে কেন, পৃথিবীর কোনও মেয়েই বোধ হয় তোমার ছেলের চক্ষে লাগবে না, তা যত বড় রূপসীই হ'ক।"

"কেন গো? এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা বলছ তুমি!"

"আশ্চর্য্য হ'ক, কিন্তু আমি যা বলছি, তা সত্যি, তুমি দেখে নিও, অরুর এখন কোনও মেয়েই মনে ধরবে না।"

"কারণ?"

"তার মন অন্য-এক জায়গায় বাঁধা পড়েছে।"

চৌধুরীমহাশয়ের বিস্ময় এবার সীমা অতিক্রম করিল। তিনি উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার ও হেঁয়ালী রেখে কথাটা সোজা করেই বল না অনু! অরু কি এর মধ্যে আর কোনও মেয়েকে ভালবেসেছে নাকি?"

"হ্যাঁ, তবে আর বলছি কি!"

"মেয়েটী কে বলতে পারো?"

"পারি বই কি! মেয়েটী দেখতে শুনতে খুবই ভাল, কিন্তু আমাদের করণীয় নয়।"

"কে বলো দেখি?"

"যে মেয়েটী আমাদের মায়াকে লেখাপড়া আর গান বাজনা শেখাতে আসে, তাকে তুমিও ত জানো।"

"ওঃ! মহেশবাবুর মেয়ে! বল কি অনু? না না, তোমার এ ধারণা ভুল ও তো হতে পারে।"

"বেশ, ভাল করে না জেনেই কি আমি কথাটা তোমার সাক্ষাতে ভাঙ্গি?"

চৌধুরী মহাশয়ের মুখে চক্ষে দারুণ উদ্বেগ ঘনাইয়া আসিল। ক্ষণেক

স্তম্ভিত নির্ব্বাক্ থাকিয়া তিনি অপ্রসন্ন স্বরে তিক্তকণ্ঠে কহিলেন, "সাধ করে এ পাপকে ঘরে ডেকে আনা, বড়ই ভুল হয়ে গেছে অনু! ওসব মেয়েদের কখনই বিশ্বাস করতে নেই।"

অনুপমা কন্যার শিক্ষয়িত্রীর পক্ষ লইয়া বিরক্তিভরে বলিলেন, "কেন গা? সে মেয়ের এতে কি দোষ হ'ল? দোষ তো তোমার ছেলের। সে নিজেই তো কেবল ঘনিয়ে ঘনিয়ে ছোঁক্ ছোঁক্ করে বেড়াচ্ছে, বেলার কাছে আস্কারা পায় নি তাই, নইলে এদ্দিন করেই না—"

বাধা দিয়া কর্ত্তা রুক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! তুমি থামো! ওসব ব্রহ্ম ছুঁড়ীদের ধরণ ধারণ তুমি তো কিছু জান না, ওরা কেবল শিকার খুঁজে বেড়ায়, দেখেছে বড়লোকের ছেলে তায় আবার সুপুরুষ, অমনি মায়ায় ভুলিয়ে হাত করবার চেষ্টা!"

"তোমার এক কথা! ব্রাহ্ম মেয়েরা কি সবাই এমনি হয় নাকি? ভাল মন্দ সব সমাজেই আছে। আমাদের হিন্দু ঘরেই দেখোনা, কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকেরা মেয়েদের সুপাত্রে দেবার জন্য কি না করছে বলো? আর বাস্তবিক তুমি যা ভাবছ সে তা নয়, এই অল্প দিন দেখেই আমি বুঝেছি, বেলা মেয়েটী বড় ভাল। যাকে বলে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, সে তাই।" চৌধুরীমহাশয় মনের ক্রোধ ও বিরক্তির মধ্যেও একটু হাসিয়া বলিলেন, "এযে দেখছি সেই লক্ষ্মী সরস্বতী ঠাকরুণটা শুধু ছেলের মনই ভোলায় নি, ছেলের মাকেও ভুলিয়েছে।"

"তা বড় মিথ্যে নয়, ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে, নইলে ঐ মেয়েটীর সঙ্গেই আমি অরুর বিয়ে দিতে বলতুম। ওরকম বউ না হলে তোমার ছেলেকে কেউ শোধরাতে পারবে না।"

গৃহিণীর মুখে বারম্বার পুত্রনিন্দা শ্রবণে চৌধুরীমহাশয় কিছু আহত ও ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "কেন? অরু কি এতই অধঃপাতে গিয়েছে নাকি?

একবার যেমন তেমন করে ধরে বেঁধে তার বিয়েটা দিয়ে ফেলি, তার পর দেখি সে কেমন না শোধরায়।"

অনুপমা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ছেলে বিয়ে করলে তো? যে রকম গতিক দেখছি—"

"করবে ওর ঘাড়, আমি এক্ষুণি ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি, কিন্তু তুমি ঐ মায়াবিনীটাকে আজই বিদেয় করে দাও অনু! বরং মাইনেটা এমাসের পূরোই দিয়ে দিও, বুঝলে?"

অনুপমা অসন্তোষের সহিত বলিলেন," বেশ! মেয়েটা একটু কিছু শিখছিল, তোমার ছেলের জ্বালায় তা ও বন্ধ করতে হল।"

"বন্ধ করতে হবে কেন? কলকেতা সহরে আবার লোকের অভাব? তুমি তো আগে কখনো এবিষয় আমাকে বলো নি, নইলে কবেই না বন্দোবস্ত করে দিতুম। সে সব হয়ে যাবে, এখন অরুণকে আমার কাছে ডেকে দিতে কাউকে বলো দেখি।"

অরুণ তখন নিজের ঘরেই ছিল, বেশভূষা সমাধা করিয়া সে সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য বাহির হইতেছিল, সেই সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল কর্ত্তা তাহাকে ডাকিতেছেন।

কর্ত্তার এই অসাময়িক আহ্বানে কিছু সন্ত্রস্ত হইয়া অরুণ অবিলম্বে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। পিতার মুখের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল, গতিক ভাল নয় আজ একটা দুর্য্যোগ অবশ্যম্ভাবী। তাহার বিবাহে আপত্তির কথাটা হয়ত ইহার মধ্যে পিতার কাণে উঠিয়াছে।

পুত্রের উদ্বেগভরা মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া চৌধুরীমহাশয় রুক্ষস্বরে বলিলেন, "শুনলুম তুমি ঐ জমীদার বাড়ীতে বিয়ে করতে রাজি নও, কথাটা কি সত্যি?"

অরুণ পিতার সে দৃষ্টি ও প্রশ্নে সঙ্কুচিত হইয়া অধোবদনে উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ, কেবল ঐ জমীদার বাড়ী কেন, উপস্থিত বোধ হয় আমি কোনও বাড়ীতেই বিয়ে করতে পারবনা।"

চৌধুরী মহাশয়ের গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীরতর হইল। তাঁহার দিকে চোখ ঠারিয়া গৃহিণী ইসারায় কহিলেন, "দেখলে? আমি কি মিথ্যাবাদী।" সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কর্ত্তা পুনরায় পুত্রকে প্রশ্ন করিলেন, "কেন,—না পারবার কারণটা কি তোমার শুনি?"

অরুণ এবার মহা সমস্যায় পড়িয়া গেল। পিতার এ প্রশ্নের উত্তরে সে এখন কি বলিবে? এই বিবাহ করিতে না পারার প্রকৃত কারণ অবগত হইলে তিনি যে কত রুষ্ট হইবেন, কত খানি আঘাত পাইবেন, এবং এখনই কি অনর্থ বাধাইয়া তুলিবেন, সে কথা কল্পনা করিতেও অরুণের দেহ মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

সে আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় আপাততঃ প্রকৃত তথ্য গোপন রাখিয়া ইতস্ততঃ করিতে করিতে ঘাড় চুলকাইয়া বলিল "আমার মতে নিজে উপার্জ্জনক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত বিয়ে করাটা কোনও মতেই উচিত নয় বাবা! তাই মনে করছি, অন্ততঃ এম, এ, টা পাশ না করে—"

"ও! এই কথা!" চৌধুরীমহাশয়ের অন্তরের মেঘ অনেক খানি কাটিয়া গেল। তিনি পুত্রের দ্বিধাগ্রস্ত সঙ্কোচ-নত মুখের দিকে চাহিয়া প্রসন্নহাস্যে অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "কথাটা ন্যায়সঙ্গত হইলেও তোমার পক্ষে যে ঠিক খাটে না অরু! তোমার বাপ যে নেহাৎ দীন দরিদ্র নয়, তাতো তুমি জানো; আমি এতদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে এত উপার্জ্জন করে মরলুম সে কার জন্য? আর তুমি শুনেছ বোধ হয় যিনি তোমার শ্বশুর হবেন তিনি অপুত্রক, ভবিষ্যতে ঐ মেয়ে দুইটীই বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। অতএব ওসব সৃষ্টিছাড়া ভাবনা না

ভেবে বিয়েটা করে ফেলাই তোমার পক্ষে এখন বুদ্ধিমানের মত কাজ করা হবে।”

অরুণ কথা কহিল না। তাহার অবনমিত মুখে চক্ষে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। পুত্রের সে মৌন ভাব সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া চৌধুরী মহাশয় হৃষ্ট অন্তরে বলিলেন, “কি বলো রাজি? তা’হলে আরতো তোমার কোনও আপত্তি নেই?”

নিরুপায় অরুণ স্বেদাক্ত শরীরে, কম্পিত বক্ষে পিতাকে অনুনয় করিয়া বলিল, আমি তা এখন ঠিক করে বলতে পারছি না। আপনি দয়া করে আমাকে এবিষয় ভালো করে ভেবে দেখবার জন্যে অন্ততঃ দু’চার দিন সময় দিন বাবা!”

চৌধুরীমহাশয় ঈষৎ বিরক্তির সহিত বলিলেন, “বেশ, তাই হবে, কিন্তু তোমার এত ভাববার চিন্তোবার কারণ যে কি সেইটেই যে আমার বুদ্ধিতে আসছে না। যাক, দুচার দিন তো নয়, মাত্র দুটী দিন আমি তোমাকে দিতে পারি। তার বেশী নয়। এরি মধ্যে ভেবে চিন্তে স্থির করে ফেলো, বুঝলে?”

অরুণ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া যাইতেছিল চৌধুরী মহাশয় কি ভাবিয়া তাহাকে পুনরায় ডাকিলেন। বলিলেন, “দেখো অরুণ! ওসব পাগলামী তুমি এখন ছেড়ে দাও বাবা! আমি যা করছি তোমার মঙ্গলের জন্যই করছি।”

“আজ্ঞে তা জানি, কিন্তু—”

“কিন্তু কি? আমি বলি ইতিমধ্যে মেয়েটীকে তুমি একবার স্বচক্ষে দেখে এসো, যদি তোমার পছন্দ না হয় তবে—”

“না বাবা! তার আর দরকার নেই, আপনি নিজে দেখে পছন্দ করে এসেছেন, সেই যথেষ্ট।”

পুত্রের বিনীত বচনে তুষ্ট হইয়া চৌধুরীমহাশয় আশ্বস্ত চিত্তে কহিলেন, "বেশ আমি তোমাকে কাল পরশু দুদিন সময় দিচ্ছি, বেশ করে' ভেবে দেখো, এ বিয়েতে তোমার সব দিক থেকেই লাভ বই লোকসান হবে না।"

অরুণ দৃষ্টির অন্তর হইতেই চৌধুরীমহাশয় গৃহিণীর দিকে গর্ব্বোৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া প্রীতিকণ্ঠে কহিলেন, "দেখলে ? অরুণকে তুমি যে রকম ব্যায়াড়া মনে করছ, সে বাস্তবিক তা নয় অনু ! ওসব শুধু ছেলেমানুষি ; বয়সের ধর্ম্ম, সময় হলে আপনিই শুধ্‌রে যাবে।" গৃহিণীর কাছে আমিল না পাইয়া তিনি গলার স্বর খাটো করিয়া সহাস্যবদনে চুপি চুপি বলিলেন, "আসল কথা কি জানো অনু ! এখনকার ছেলেদের সব চোখ কাণ ফুটেছে, ওরা চায় বউটী নিয়ে সাহেব মেমের মত স্বাধীনভাবে থাকতে, বুঝলে কিনা !"

আট

সেদিনও ঘন বরষা। অরুণের দুর্জ্জয় প্রলোভন ও মোহজাল হইতে আপনাকে জোর করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া বেলা যখন তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন ঝড় বৃষ্টি একসঙ্গেই আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বেলার অন্তরের বিপ্লব তখন যেন সেই বর্ষা-প্রকৃতির দুর্যোগকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল।

কি এক উন্মাদনাময় অপূর্ব্ব ভাবের প্রেরণায় বিবশ বিহ্বল হইয়া তাহার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলি সেই ঝর ঝর বাদলধারার সহিত সুর মিলাইয়া রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ করিয়া বাজিতেছিল। বারিসিক্ত উতলা ঝড়ের বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, সেই ক্ষণপূর্ব্বের শ্রুত, নিশীথের স্বপ্নালস ভরা বাঁশীর মোহন তানের মত মধুর করুণ কণ্ঠস্বর, সেই আবেগাপ্লুত, আকুল প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস, আর সেই ব্যথাভরা ব্যাকুল প্রেম নিবেদন। হায় রে বেলার সমস্ত মনপ্রাণ যে সেই মুহূর্ত্তে সেই প্রেমের দেবতারূপী প্রেমার্থীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িতে চাহিয়াছিল, সে কত যত্নে তখন আত্মসম্বরণ করিয়াছে, কত কষ্টে পাষাণে বুক বাঁধিয়া, দুর্ভাগিনী সে তাহার প্রার্থিত আকাঙ্ক্ষিত নিধিকে হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কেন? তাহাদের মিলনের আশা কি যথার্থই দুরাশা? দীনহীনার এ রাজসম্পদ লাভের স্বপ্ন কি সত্যই সফল হইতে পারে না? পোড়া সমাজের বাঁধন কি এতই দৃঢ়, এমনি দুশ্ছেদ্য? এ বাঁধন সবলে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া যদি এই পরস্পর মিলনাকাঙ্ক্ষী প্রেমমুগ্ধ প্রাণদুটী সম্মিলিত হয়; তাহা হইলে সে মিলন কি বস্তুতঃই সুখের হইবে না? কেন হইবে না? সে তো জানে তাহার

জীবন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক, পিতৃমাতৃঘটিত কলঙ্ক সে তো নিন্দুকের রসনা তৃপ্তির, ঈর্ষান্বিতের মর্ম্মদাহ মিটাইবার একটা ছল মাত্র। কিন্তু বেলা কি শুধু তাহার হৃদয়ভরা প্রেমের অর্ঘ্য দিয়াই তাহার জীবন-দেবতাকে তুষ্ট করিতে পারিবে? তাহার প্রাণঢালা ভালবাসায় কি তাহার জীবনের সমস্ত অভাব সমস্ত ক্ষোভ সে নিবারিত করিতে পারিবে? এই সংশয় আনন্দের দ্বন্দ্ব দোলায় পড়িয়া বেলা আর কিছুতেই আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

বিপর্য্যস্ত অবসন্ন দেহ মন লইয়া সে মাতালের মত টলিতে টলিতে ঘরে গিয়া প্রসারিত শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। বেলার সকল চিন্তাকে ছাপাইয়া বিবেকশক্তিকে পরাস্ত করিয়া তখন আকুল প্রাণে জাগিতেছিল শুধু একটা পাইয়া বঞ্চিত হওয়ার ব্যথা, তাহার দুর্ভাগ্যজীবনের এই অযাচিত পাওয়া দুর্ল্লভ শুভমুহূর্ত্তটুকু অবোধের মত সে আজ কেন হেলায় হারাইয়া আসিল? প্রাণের দেবতার করুণার দান সে কেন মাথা পাতিয়া লইল না? কিন্তু হায়রে! এ কিন্তুর বুঝি আর শেষ নাই!

দেখিতে দেখিতে বেলা শেষ হইয়া আসিল। ঝড় থামিল, বৃষ্টিও মন্দীভূত হইল। দিনান্তের শেষ পাণ্ডুর আলোটুকু ঝাঁপসা হইয়া গিয়া বেলার নিভৃত কক্ষটিতে মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া উঠিল। কিন্তু বেলা তখনও উঠিল না, ঘরে আলোও জ্বালিল না। তাহার সেই হর্ষ-বিষাদ পুলক-বেদনা মিশ্রিত নবজাগ্রত অনুভূতি ও চিন্তার মধ্যে সে একেবারে মগ্ন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল।

জয়ন্তী ধীরে ধীরে এক সময় ঘরে ঢুকিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "একি ঘর অন্ধকার কেন বেলা? এই সাঁঝসকালেই ঘুমুলি নাকি?"

বেলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল, "না বউদি! তুমি এই বিষ্টিতে কেন এলে ভাই?—ভিজেছ?—বসো, আগে আলোটা জেলে দিই।"

"ভিজব কেন? ছাদ দিয়ে আসিনি তো, ভেতরকার দোর খুলিয়ে এসেছি।" জয়ন্তী নিজেই আলোর সুইচটা টিপিয়া দিল। সমুজ্জ্বল তড়িতালোকে ঘরখানি নিমেষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই আলোয় বেলার বেশ ভূষার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জয়ন্তী, জিজ্ঞাসা করিল, "এই মাত্র ফিরলি বুঝি?" বেলা ঈষৎ লজ্জিত ভাবে কহিল, "না বউদি, আমি সেখান থেকে আজ সব দিনের চেয়ে সকাল সকাল ফিরেছি, মায়া তার মার সঙ্গে কোথায় নেমন্তন্ন গেল কি না—"

"কিন্তু চৌধুরীদের মোটরের শব্দ তো শুনতে পাইনি।"

"না, মোটরে যে তাঁরাও গেলেন, আমি তো ভাড়াটে গাড়ীতে এলুম।"

"তবে এখনো কাপড় পর্য্যন্ত ছাড়া হয়নি যে? ব্যাপার কি?"

বেলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বাধ বাধ ভাবে বলিল "কিছুই না কেমন যেন আলিস্যি আলিস্যি বোধ হচ্ছিল তাই কাপড় চোপড় না ছেড়েই গড়িয়ে পড়ে ছিলুম।"

"কেন বল্ দেখি? শরীরটা বেশ ভাল আছে তো?' জয়ন্তী কিছু ব্যস্ততার সহিত বেলার একখানি হাত নিজের মুঠার ভিতর চাপিয়া তাহার দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া বলিল "গাটা যেন গরম গরম ঠেকছে না?"

"না বউদি! শরীর আমার খুব ভালই আছে সেজন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ো না, তুমি আমার কাছে বসো দেখি।"

জয়ন্তী বেলার পাশে বসিয়া তাহার লজ্জায় ও উত্তেজনায় আরক্ত সুন্দর মুখখানির পানে সোৎসুকে চাহিয়া রহস্য করিয়া বলিল, "তবে কি? মনের বিকার? চক্ষু ছল ছল, গাল দুটীতে যেন রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে, আজ কি হয়েছে লো?"

"কি আর হবে? তোমার যেমন কথা!"

"সত্যি কিছু হয় নি?"

"না গো না কতবার বলব?"

"কিন্তু আমি বলছি, আজ নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে, আর যা হয়েছে তা সহজ নয়, সাংঘাতিক! তুই না বল্লেও ব্যাপারটা আমি আন্দাজে বুঝে গেছি।"

জয়ন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া বেলা সকৌতুকে হাসিয়া বলিল, "তুমি বুঝি অন্তর্য্যামী বৌদি; আচ্ছা কি বুঝেছ বল দেখি আজ আমার কি হয়েছে"?

"বলব? তবে শোন, পরশমণির সংস্পর্শ লাভ।"

বেলার হাসি ভরা চঞ্চল চক্ষুদুটী আপনা আপনি নত হইয়া পড়িল জয়ন্তী তাহার দিকে সন্দিগ্ধ নয়নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কেমন? আমি ঠিক বলেছি কি না?"

মৃদু মধুর সলজ্জ হাসিতে গোলাপী অধরখানি রাঙ্গাইয়া তুলিয়া বেলা উত্তর দিল," ঠিক তোমার আন্দাজ, একটুও ভুল নয়। কিন্তু আমি বড় একটা সমস্যায় পড়ে গেছি যে বৌদি!"

"কিসের সমস্যা?"

"আমি বুঝতে পারছি না, তোমার সে পরশমণি—সত্যিই পরশমণি, না শুধুই পাথর।"

"বলিস কি? আচ্ছা, আমাকে ব্যাপারটা সব খুলে বলদেখি বেলা; তুই কার কথা বল্‌ছিস?" কৌতূহলে অধীর হইয়া জয়ন্তী বেলার আরও কাছে সরিয়া বসিল। বলিল," কি রকম কি হ'ল তা বল্‌তো ভাই শুনি।"

জয়ন্তীর কাছে বেলার গোপনীয় কিছুই ছিল না। যে ঘটনার উপর

তাহার ভবিষ্যতের সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতি সমস্তই নির্ভর করিতেছে, সে ঘটনা তাহার জীবনের এই একমাত্র সুখ-দুঃখভাগিনী হিতৈষিণীর নিকট সে গোপন রাখিতে পারিল না, গোপন রাখা সঙ্গতও বিবেচনা করিল না। বেলা তখন লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া তাহার ও অরুণের প্রথম দিনের আলাপ হইতে আজিকার অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিষয় সমস্তই জয়ন্তীকে আনুপূর্ব্বিক জানাইল। একটী কথাও গোপন করিল না। শুনিয়া জয়ন্তীর চিত্তে হর্ষ ও বিষাদ একসঙ্গে উদ্দীপিত হইল। সে খানিক নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল, "চৌধুরী মহাশয়ের ছেলেটী তো দেখ্‌তে শুনতে বেশ ভালই শুন্‌তে পাই, তবে বড়লোকের ছেলে, নিজে এখনো স্বাধীন নয়, তাই ভয় হয় যদি শেষ রক্ষে না করতে পারে।"

বেলা চিন্তিত মুখে বলিল, আমারও সেই ভাবনা বউদি! সেইজন্যেই তো আমি তাঁকে এ আশা ত্যাগ করতেই বলে এলুম।"

বেলার প্রচ্ছন্ন ব্যথাভরা সায়াহ্ন কমলের মত করুণ সুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া জয়ন্তী স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তুই বল্লেই কি তিনি এ আশা ত্যাগ করবেন বেলা? তা মনেও করিস্ নি। এ মোহন রূপে যে একবার মজেছে, সেকি আর কোনও কালে ভুলতে পারবে? আমি তো আগেই বলেছিলুম এ মোহিনী মূর্ত্তি নিয়ে যেখানে যাবি সেইখানেই সুরাসুরের দ্বন্দ্ব বেঁধে যাবে! তাতো শুন্‌লি না তখন।"

বেলা ম্লান মুখে হাসি আনিয়া বলিল, "তোমার ঐ এক কথা বউদি! দ্বন্দ্ব আবার বাঁধল কোথায়? তাঁর বিয়ের তো সব ঠিক, সে মেয়েটীও নাকি খুব সুন্দরী, তার পর বড় জমীদারের মেয়ে, একবার বিয়েটা হয়ে গেলেই তো সব ল্যাঠাই চুকে যাবে। তখন আমার কথা কখনো ভুলেও মনে পড়বে না বোধ হয়।" শেষের কথাটা বলিবার সময় বেলার স্বর যেন কম্পিত আদ্র হইয়া আসিল।

জয়ন্তী অবিশ্বাসের সহিত মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু!—সে যে অসম্ভব!— ভালবাসা কি এত সহজে ভোলবার জিনিষ ভাই? তবে বলা যায় না, বড় লোকের ছেলে যদি শুধু খেয়ালের বশেই—"

"সেইজন্যেই তো আমি আমার অসম্মতি জানিয়ে এসেছি, আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।"

"কিন্তু তোর এমনভাবে অসম্মতি জানানোটাও ঠিক হয় নি বেলা! মনে কর সে যদি তোকে সত্যিকারের ভালবাসা বেসে বিয়ে করে, তা হলে তোর কিসের দুঃখ, কিসের ভাবনা, তুইতো তা'হলে রাজরাণী রাজ-আদরিণী হবি ভাই!"

রাজরাণী হ'ব, কি পথের কাঙ্গালিনী হ'ব,—তারই বা ঠিক কি? তিনি ঝোঁকের মাথায় আমাকে বিয়ে করলেও তাঁর বাপ মা কি আমাকে পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করতে পারবেন মনে করেছ বউদি? কখনো নয়, সে যে অসম্ভব।"

"তা নাই বা করলেন কিন্তু স্বামী সুখে স্বামী সৌভাগ্য তো তোকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না বেলা? তা ছাড়া অরুণবাবু তো নিজে মূর্খ কি অক্ষম নন।"

"না বউদি সে হয় না, [illegible] অনুচিত।"

"জয়ন্তী ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "কিসে অনুচিত? আমি তোকে বুদ্ধিমতী মেয়ে মনে করতুম বেলা! কিন্তু আজ বুঝলুম, তোর ঘটে এককড়া বুদ্ধি বিবেচনা নেই, তা থাকলে কি এমন করে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে পারতিস্?"

বেলা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "তা যাই বলো বউদি, কিন্তু একটা সংসার ছারখারে দিয়ে, গুরুজনের অভি-

শাপ মাথায় করে, শুধু নিজের সুখ স্বার্থের অনুরোধে আমি এত বড় গর্হিত কাজ কখনই করতে পারব না। আমার জন্যে তাঁর অতবড় মহৎ জীবন, কেন ব্যর্থ হবে ভাই ?"

জয়ন্তী মনে মনে বেলার বুদ্ধি ও স্বার্থগন্ধহীন নিষ্কাম প্রেমের যথেষ্ট প্রশংসা করিল। একটু ভাবিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে সে বলিল, "তাহলে তোর দশা কি হবে ভাই ; তুই এখন কি করবি ?"

কি যে করিবে বেলা তাহা নিজেই ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, কিন্তু মনের সে ব্যাকুলতা ও উদ্বেগ গোপন করিয়া সে দৃঢ়তার সহিত বলিল," সেখানে আর যাব না,"

"না গিয়ে থাকতে পারবি ?"

"কেন পারব না ? তুমি কি আমাকে এতই দুর্ব্বল মনে করছ বউদি ?"

"কিন্তু তুই না গেলেও কি সব গোল মিটে যাবে বেলা ? তোর ওপর যদি তাঁর যথার্থই ভালবাসা জন্মে থাকে, তা'হলে এখন তাঁকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তিনি তাঁর প্রাণের টানে নিজেই যে তোর কাছে ছুটে আসবেন।"

বেলা উদাস স্বরে বলিল, "আসেন, আসবেন, কিন্তু আমার যা কর্ত্তব্য তা' আমি করব।"

প্রিয়তমের মঙ্গল কামনায় বেলা তাহার জীবনের সুখ ও স্বার্থ বলি দেওয়াই স্থির সঙ্কল্প করিল এবং সেই সঙ্কল্প রক্ষার্থে তাহার বহু আয়াসলব্ধ এই শিক্ষয়িত্রীর কাজটুকু এখন পরিত্যাগ করাই সে উচিত বোধ করিল। কিন্তু পরদিন ইস্তাফা দিবার জন্য বেলা যখন চৌধুরী-গৃহে গমন করিল, তখন কথাটা কি ভাবে পাড়িলে ভাল হয়, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সে নিত্যকার মতই ছাত্রীকে পাঠ শিক্ষা দিতে বসিয়া গেল। কেবল

অরুণের মোহময় পিপাসিত দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই সে শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া সেদিন তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিয়া গেল। কিন্তু ইস্তফা দিবার প্রয়োজন হইল না, পরের দিন বেলা নির্দ্দিষ্ট স্থানটীতে গিয়া বসিতেই তাহার ছাত্রী মায়া সঙ্কুচিত পদে আসিয়া বেলার হস্তে তাহার একমাসের বেতন স্বরূপ কিছু টাকা ও নোট অর্পণ করিয়া শুষ্কমুখে ম্লানভাবে জানাইল, মা বলিতেছেন অতঃপর আর তাহার শিক্ষকতার প্রয়োজন নাই, মায়াকে কোনও স্কুলে দেওয়া হইবে। বেলা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া আসিলেও এ সংবাদ তাহাকে যেন মর্ম্মে মর্ম্মে আহত করিল। সে বুঝিতে পারিল, অধৈর্য্য অরুণ ইহারই মধ্যে তাহার পাগলামীর কথা বাড়ীতে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, সেজন্য সাবধানতার অনুরোধে এ পাপ বিদায় করিবার আয়োজন। লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে মরমে মরিয়া গিয়া সে কয়েকটী টাকা মায়াকে ফেরত দিতে উদ্যত হইল. বলিল, "আমার তো পুরো এক মাস হয় নি, তুমি এক হপ্তার বেশী এনেছ কেন?"

মায়া লইল না; হাত সরাইয়া লইয়া বলিল, "মা যে দিলেন, বল্লেন যদি এর পরে -"

"তা হোক, তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলো, আমি যতদিন কাজ করেছি তার চেয়ে বেশী নিতে পারব না, সেজন্যে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।"

ম্লানমুখী মায়ার হাতে টাকা কয়টী জোর করিয়া গুঁজিয়া দিয়া, বালিকাকে বিদায় সম্ভাষণ পর্য্যন্ত না জানাইয়াই দুঃসহ লজ্জা ও অপমান হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বেলা তাড়াতাড়ি আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু তাহার অবাধ্য তৃষিত দৃষ্টি শাসন বারণ না মানিয়া সেই

দিকে ধাইয়া গেল, যেখানটীতে অরুণ নিমেষের দৃষ্টি বিনিময়ের আকুল আকাঙ্ক্ষা লইয়া নিত্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত, কিন্তু সেখানে আজ কেহই ছিল না।

বেলার শেষ সাধ পূর্ণ হইল না। মর্ম্মপীড়িত ব্যথিত চিত্তে, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বেলা তাহার অনাগত প্রিয়তমের নিকট আজ জন্মশোধ বিদায় গ্রহণ করিল।

নয়

চৌধুরীমহাশয় পরম আশান্বিত উৎসুক চিত্তে পুত্রের মত পরিবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিবসে অরুণ যখন পিতার সাক্ষাতে আহূত হইয়া সেই পূর্ব্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করিল, অর্থাৎ বিবাহ এখন সে কিছুতেই করিতে পারিতেছে না, তখন পিতার মনে বিস্ময় ক্ষোভ ও ক্রোধ এক সঙ্গে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পুত্রের অবাধ্যতায় রুষ্ট হইয়া তিনি রূঢ় বচনে কহিলেন, "কিন্তু তোমার আপত্তির প্রকৃত কারণ যে কি, তা আমাকে আজ ঠিক ক'রে বলো, বলতেই হবে, বলো তোমার বিয়ে করতে কেন ইচ্ছে নেই ?"

অরুণ নীরব, অধোমুখ। উত্তর না পাইয়া চৌধুরীমহাশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। ভর্ৎসনার স্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলো ! অমন করে চুপটা করে থাকলে ত চলবে না।"

ব্যথাপূর্ণ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উত্তর আসিল, "আপনি আমায় ক্ষমা করুন, মানুষের ইচ্ছার উপর ত' জোর চলে না বাবা !"

"বটে !"

পুত্রের সেই অপরাধীর মত ভাবে ও বাক্যে চৌধুরীমহাশয়ের মনে পড়িল গৃহিণীর কথা। অরুণের পানে দীপ্ত নেত্রে চাহিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তাহলে কথাটা কি সত্যি ? যথার্থই কি তুমি মহেশবাবুর মেয়েকে ভালবাসো, সেইজন্যেই কি, তোমার এই আপত্তি ?"

অরুণ এ দুই দিন অহোরাত্র ভাবিয়াছে, অদম্য মনোবৃত্তির সহিত বিস্তর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়াছে এবং সে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সে স্থির জানিয়াছে, তাহার জীবনের আরাধ্যা দেবী বেলার আশা পরিত্যাগ করা তাহার

পক্ষে এখন অসম্ভব। বেলা'কে পাইবার জন্য অরুণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাই সে চিত্ত দৃঢ় ও সংকল্প স্থির করিয়া মনে সাহস আনিয়া কথাটা নিতান্ত রূঢ় ও অপ্রিয় হইলেও পিতার সাক্ষাতে বলিয়া ফেলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি আমার গুরু, আমার পূজ্য, আপনার কাছে আমি মিথ্যে কথা বলতে চাই না, আপনি যা শুনেছেন তা সত্যি।"

পুত্রের এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি চৌধুরীমহাশয়কে বিকল করিয়া তুলিল, তিনি রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া সতর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ! বল কি? কিন্তু তোমার এই অবৈধ প্রেমের পরিণামটা কি রকম দাঁড়াবে, সেটাও কি ভেবে দেখেছ?"

এই 'অবৈধ' শব্দটা অরুণের অন্তরে শব্দভেদী বাণের মতই বিষম বাজিল। ক্ষুব্ধ আহত কণ্ঠে সে উত্তর করিল, "আপনি ভুল বুঝছেন বাবা! আমি তাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করতে চাই।"

"বলকি?" বর্দ্ধিত ক্রোধে ও বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চৌধুরী-মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি পাগল হয়েছ অরুণ? এ যে একেবারেই অসম্ভব!"

"অসম্ভব তা জানি, কিন্তু—" অরুণ এতক্ষণ পরে তাহার সঙ্কোচ-নত চক্ষু দুটী পিতার পানে তুলিয়া বিনয়-নম্র কণ্ঠে করুণ স্বরে কহিল, "আপনি দয়া করলে যে অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে বাবা। তাদের সমাজ ও ধর্ম্ম ভিন্ন হ'লেও—"

শুধু তাই নয়, ও মেয়েটার যে আর একটা কলঙ্ক আছে, তা তুমি এখনো জাননা বোধ হয়।"

"জানি, কিন্তু সে কলঙ্ক নয়, লোকাপবাদ। আর যদি এ অপবাদ যথার্থও হয়, তাহলে তা'র এতে দোষ কি বলুন? পিতামাতার পাপের দণ্ড সন্তানকে বহন করতে হবে এযে বড় অন্যায় কথা!"

"অন্যায় হলেও সমাজের যা বিধান, তা সামাজিক লোক মাত্রকেই মেনে চলতে হ'বে।"

"কিন্তু এমন অন্যায় বিধান—"

"অরুণ!" চৌধুরীমহাশয় পুত্রকে বাধা দিয়া দৃপ্তকণ্ঠে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ছোটমুখে বড়কথাটা মোটেই সাজে না, অরুণ! ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দর তুমি এখন বোঝ কি? সেদিনকার ছেলে!"

অরুণ সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গিয়া কাতর আবেদনের ভাবে বলিল, "আপনি আমাকে দয়া করুন বাবা! ভেবে দেখুন, লোকে পঙ্ক থেকেও তো পদ্মফুল তোলে।"

পুত্রের এই দুঃসাহস ও নির্লজ্জতা চৌধুরীমহাশয়কে ক্ষণেকের জন্য হতবাক্ স্তম্ভিত করিয়া তুলিল। এ-কালের ছেলেদের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিকে মনে মনে শত শত ধিক্কার দান করিয়া তিনি তিরস্কার ত্যাগ করিয়া পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ, এখনো বলছি, যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহলে এসব দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দাও অরুণ, নইলে ভবিষ্যতে এত দুঃখ, এমন কষ্ট পাবে, যা তুমি এখন ধারণাও করতে পারো না।"

কাতর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর আসিল, "তা জানি, কিন্তু আমি এখন সব দুঃখ, সব কষ্টই সহ্য করতে প্রস্তুত আছি বাবা! আপনি শুধু দয়া করে আমাকে অনুমতি দিন।"

"কি!" পুত্রের ধৃষ্টতা পিতাকে অধৈর্য্য উত্তেজিত করিয়া তুলিল। আরক্ত চক্ষে, রোষ-কম্পিত তর্জ্জন স্বরে চৌধুরীমহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "আমি তোমাকে অনুমতি দেব? যার জাতজন্মের কিছু ঠিক ঠিকানা নেই, সেই মেয়েকে পুত্রবধূ করে' আমার বংশের সুনাম, পবিত্র কুলগৌরব কলঙ্কিত করব? সমাজের সম্মান প্রতিষ্ঠা সব বিসর্জ্জন দিয়ে সেই কোথাকার পাপকে—"

বাধা দিয়া আর্ত্ত করুণ স্বরে অরুণ কহিল, "ও কথা বলবেন না বাবা। সে নির্দ্দোষী, নিষ্পাপ, ফুলের মত পবিত্র—"

"চৌধুরীমহাশয় মুখ বিকৃত করিয়া শ্লেষজড়িত ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "ব্যস্ চুপ করো! তোমার ও সব কবিত্ব শোনবার মত আমার অবস্থা বা ফুরসৎ এখন নেই। শুধু জান্‌তে চাই তুমি এ বিয়েতে সম্মত আছ কি না?"

"না।"

"না? ঠিক করে বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার এ অবাধ্যতা আপনি ক্ষমা করুন।"

পুত্রের অবিচলিত স্থির কণ্ঠস্বরে বিস্ময়াপন্ন ও রুষ্ট হইয়া চৌধুরী মহাশয় তাহার মুখের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে মুখে স্থির সংকল্প ও দৃঢ়তার চিহ্ন স্পষ্ট বিদ্যমান। মর্ম্মাহত ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন, "তাহলে কি করবে? সেই মায়াবিনী নষ্ট ছুঁড়ীটাকেই কি শেষে—"

তীব্র অধীর স্বরে অরুণ বলিয়া উঠিল, "আপনি আমাকে যা খুসী তাই বলতে পারেন, কিন্তু একজন ভদ্রকন্যাকে এ ভাবে অপদস্থ করবার—"

"ভদ্রকন্যা? তাই নাকি?" শ্লেষপূর্ণ তীক্ষ্ণকণ্ঠে চৌধুরীমহাশয় বলিলেন, "নাঃ! তুমি একেবারেই জাহান্নমে গিয়েছ দেখ্‌ছি! সেই ভদ্রকন্যাটীকে বিয়ে করলে তোমার কি দুর্দ্দশা হবে জানো? সমাজে পতিত হয়ে—"

বাধা দিয়া অরুণ বলিল, "সেজন্যে আমার কোনও দুঃখ নেই।"

কিন্তু শুধু তাই নয়, আমার সঙ্গে, সমস্ত আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক তাহলে ছাড়তে হবে। কুলাঙ্গার পুত্রের বদ্‌খেয়ালী

মিটাবার দায়ে আমি আমার পূর্ব্বপুরুষের সুনাম সম্ভ্রম সব রসাতলে দিতে পারব না তো ?"

ব্যথা-বিদ্ধ, অভিমান-সংক্ষুব্ধ স্বরে অরুণ উত্তর করিল, "আমি তো তা বলছি না বাবা! আপনার কুলাঙ্গার পুত্র তার দুর্ভাগ্য নিয়ে আপনিই দূরে সরে যাবে।"

পুত্রের জেদ ও অবাধ্যতায়, ক্রোধে দুঃখে ক্ষোভে হুতাশনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া পিতা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "তবে তাই যাও, এখানে দশের মধ্যে আমার মুখে চুণ কালি দিও না। আমার "দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো!"

"বেশ তাই যাচ্ছি, আপনি নিশ্চিন্ত হন।"

ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া অরুণ চলিয়া যাইতেছিল, চৌধুরীমহাশয় হাঁকিয়া বলিলেন, "মনে রেখো, আজ থেকে আমাদের সকল সম্বন্ধই শেষ হয়ে গেল। তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র! মনে করব আমি নির্ব্বংশ!" শেষ কথাটী বলিবার সময় তাঁহার রোষদৃপ্ত উত্তেজিত কণ্ঠস্বর গাঢ় রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অরুণ তাহার গতিরোধ করিয়া নির্ব্বাক্ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের অবস্থা তখন বর্ণনাতীত। পুত্রকে দাঁড়াইতে দেখিয়া চৌধুরীমহাশয়ের হতাশ প্রাণে ক্ষীণ আশা জাগিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কিছু বলতে চাও ?"

"তাহলে কি সত্যিই আমাকে ত্যাগ করলেন ? আপনার ক্ষমা কি আমি—"

"এ জীবনে পাবে না। সে আশা করো না। তোমার মত অবাধ্য, ধর্ম্মত্যাগী, কুলত্যাগী কুপুত্রের মুখ দর্শনেও যে মহাপাপ।"

"বেশ তাই হ'ক, আপনাকে এ মহাপাতকের ভাগী করতে সে আর

কোনও দিন আসবে না, যদি আসে তাহলে সে—” নিদারুণ দুঃখে ক্ষোভে নিরুদ্ধ অভিমানের তীব্র ব্যথায় একটা কঠিন শপথবাণী উচ্চারণ করিয়া হতভাগ্য অরুণ কেন্দ্রচ্যুত উল্কার মত সবেগে বাহির হইয়া গেল।

চৌধুরীমহাশয় গমনপর পুত্রের পানে অপলকে চাহিয়া বজ্রাহতের মত নির্ব্বাক বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন। মর্ম্মাহত পিতার সন্তপ্ত অন্তরে তখন কি ভীষণ তুফান উঠিয়াছিল, তাহা সেই অন্তর্যামীই বলিতে পারেন! অনুপমা অন্তরাল হইতে স্বামী ও সপত্নীপুত্রের কথাবার্ত্তা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন, সবিশেষ জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া তিনি অরুণ ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পরক্ষণেই স্বামী সকাশে প্রকাশ হইলেন এবং সম্পূর্ণ অজানার ভাণ করিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে গো? অরুণ অমন করে হন্ত দন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল কেন? সে গেল কোথায়?”

উত্তর পাইলেন “চুলোর দোরে!”

সেই উত্তর শুনিয়া এবং স্বামীর সেই বজ্রাগ্নিগর্ভ মেঘের মত করালরূপ দেখিয়া আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে অনুপমার সাহসে কুলাইল না। গতিক মন্দ দেখিয়া তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই সরিয়া পড়িলেন।

সহনাতীত বেদনার গুরুভারে, অতর্কিত প্রচণ্ড আঘাতে মুহ্যমান হতবুদ্ধি হইয়া চৌধুরীমহাশয় পাষাণ মূর্ত্তির মত নিশ্চল অসাড় হইয়া সেইখানে একাকী বসিয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে মায়ার মৃদু আর্ত্ত কণ্ঠস্বর তাঁহার বিলুপ্তপ্রায় বাহ্য চেতনাকে ফিরাইয়া আনিল। “বাবা! বাবা! তুমি দাদাকে বকেছ কেন? সে যে রাগ করে আজ চলে গেল, বলে গেল, সে আর এখানে আসবে না, কখনো আসবে না।” বলিতে বলিতে বালিকা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ক্রন্দনজড়িত রুদ্ধপ্রায়

কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, "একি সত্যি বাবা ? সত্যি কি দাদা আর ফিরে আসবে না ? তুমি এমন কাজ কেন করলে বাবা ! দাদাকে কেন বক্‌লে ?"

বালিকা কন্যার সেই কাতরতা ও করুণ তিরস্কারে চৌধুরীমহাশয়ের নিদারুণ আঘাতে মূর্চ্ছাতুর চিত্ত পুনরায় সজাগ হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখে একটীও সান্ত্বনার বাণী ফুটিল না। শুধু নীরবে অর্থহীন শূন্য উদাস দৃষ্টিতে রোরুদ্যমানা কন্যার দিকে তিনি বিহ্বল বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন। সেই সময় গৃহিণী সেখানে পুনরাবির্ভূতা হইলেন। কন্যাকে তদবস্থায় দেখিয়া তিনি বিরক্তি সহকারে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মেয়ের যেন সকলতাতেই আধিখ্যেতা !—চলে আবার যাবে কোথায় ? যাওয়া অমনি মুখের কথাটী কিনা ? রাগটা একটু পরে গেলেই আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে, তার জন্যে খামোখা কেঁদে মরছিস কেন ?"

কিন্তু ঘরের ছেলে আর ঘরে ফিরিল না। আশায় আশায় সারাদিন-মান কাটিল, দিনের পর রাত্রি আসিল, তবু অরুণ আসিল না। অবাধ্য পুত্রের উপর রাগ অভিমান করিয়া চৌধুরীমহাশয়ও তাহার কোনই খোঁজ খবর লইলেন না। পুত্রের আশা জন্মের মত ত্যাগ করিয়া শত বিষধরের বিষের জ্বালা বক্ষে চাপিয়া তিনি নিত্যকার মতই কোর্টে গমন করিলেন। কোর্ট হইতে ফিরিয়া অসুস্থতার ভাণ করিয়া অভুক্ত অবস্থায় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শয়ন গৃহে আশ্রয় লইলেন। বন্ধু বান্ধব ও সাক্ষাৎপ্রার্থীরা সেদিন তাঁহার দেখা না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

অনুপমা অসুস্থ নির্ব্বাক্‌ স্বামীর কাছে কতক্ষণ বসিয়া রহিলেন তাঁহাকে প্রবোধ দিবার আশায় দুই একটী মিষ্ট সান্ত্বনার কথাও তিনি

পাড়িলেন, কিন্তু যাঁহাকে কথাগুলি বলা হইল তাঁহার দিক হইতে সাড়া শব্দ কিছুই না পাইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া অনুপমা অগত্যা উঠিয়া পড়িলেন, এবং নিজ শয়ন মন্দিরে আসিয়া নিদ্রিতা শিশুকন্যাটীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া তিনি অচিরাৎ নিদ্রার সুকোমল অঙ্কে বিশ্রাম লাভ করিলেন। মায়া তাহার দাদার জন্য গোপনে কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া অনেক আগেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আজ নিদ্রা ছিল না শুধু চৌধুরী মহাশয়ের নয়নে। তাঁহার বিনিদ্র চক্ষের সম্মুখে প্রহরের পর প্রহর কাটিতে লাগিল। রজনী ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিল। নিশীথিনীর শান্ত নিস্তব্ধতা ও প্রগাঢ় সুষুপ্তি গৃহে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। চৌধুরীমহাশয় তখনও তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে, কণ্টকময় শয্যায় পড়িয়া কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার স্তব্ধ আকাশের পানে ঘুমহারা নয়নের জ্বালাময় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ততোধিক স্তব্ধ অন্ধকারময় অন্তরে ভাবিতেছিলেন হতভাগ্য অরুণের কথা। নিষ্ঠুর পাষাণ সে, আজ সত্য সত্যই চলিয়া গেল! হতভাগ্য পিতার মনস্তাপ ও মর্ম্মবেদনায় একবার দৃক্‌পাতও করিল না! কোথাকার কে একটা সামান্যা স্ত্রীলোকের জন্য, পৃথিবীতে যাহার তুলনা হয় না, সেই পিতৃস্নেহের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন সে অনায়াসে ছিন্ন করিয়া গেল, করিতে পারিল? হারে! মূঢ় অকৃতজ্ঞ দুর্ভাগ্য সন্তান! এই কি তোমার পিতার প্রতি কর্ত্তব্য-পালন?

কিন্তু আজ যদি অরুণের মা থাকিতেন, তাহা হইলে কি অরুণ তাঁহার মায়া কাটাইয়া এমনি করিয়া এককথায় গৃহত্যাগ করিতে পারিত? মাতৃস্নেহ, মায়ের মমতাময় সঙ্গ পাইলে সে দিনের সেই শান্ত সুশীল বালক আজ কি এমন উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে পারিত? এই কথাটী মনে হইতেই চৌধুরীমহাশয়ের সন্তপ্ত প্রাণ একটা তীব্র ব্যথা ও হাহাকারে ভরিয়া উঠিল। মনে পড়িল মুমূর্ষু পত্নীর সেই শেষ অনুরোধ

"আমার অরুকে দেখো তুমি, তোমার হাতেই তা'কে দিয়ে গেলুম" সে অশ্রুভরা কাতর অনুরোধ তিনি যথার্থই রাখিতে পারিয়াছেন কি? মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত সন্তানের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য তিনি যথাযথ পালন করিতে পারিয়াছেন কি? পারেন নাই, নিশ্চয়ই পারেন নাই, তাই না আজ এ বিপত্তি!

সুগভীর অনুশোচনা ও অরুন্তুদ মর্ম্মব্যথায় চৌধুরীমহাশয় অধীর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার অন্তরীক্ষে চকিতের মত জাগিয়া উঠিল, পরলোকগতা পত্নীর ছায়াময়ী বিষাদময়ী মূর্ত্তি। মনে হইল হীরক খণ্ডের মত দুটী বড় বড় জল জলে নক্ষত্র, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশ করিয়া সেই অমরলোকবাসিনীর ব্যথাভরা তিরস্কার দৃপ্ত নয়নের মত তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে! চৌধুরীমহাশয় আর সহ্য করিতে পারিলেন না। জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া, উপাধানে মুখে গুঁজিয়া তিনি এতক্ষণ পরে ব্যথাহত দীর্ণচক্ষের অবরুদ্ধ অশ্রুস্রোত অবাধে উৎসারিত করিয়া দিলেন।

—০❋০—

দশ

"কাজটা তাহলে সত্যিই ছেড়ে দিয়ে এলি বেলা ?"

"ছাড়তে আর হয়নি বউদি ! আপনিই ছেড়ে গেল ।"

"কেমন করে ?"

"তোমার পরশমণির পরশ লেগে !"

বেলা কথাটা হাসিয়া বলিলেও সে হাসির মধ্যে ব্যথা ও ক্ষোভের প্রচ্ছন্ন আভাস আরো স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। জয়ন্তীর মুখ বিষণ্ণ হইল, বেলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহার সহানুভূতি ভরা করুণ নারীচিত্ত কাঁদিয়া আকুল হইল। সে চিন্তিত ম্লান মুখে বলিল, "তাহলে এখন উপায় ?"

"উপায় আর কি ? যেমন এতদিন ছিলুম তোমাদের গলগ্রহ হয়ে ।"

"ফের ! তুই কি আমাদের এতই পর মনে করিস বেলা ?"

"না বউদি ! তোমাদের চেয়ে আপনার এ পৃথিবীতে আমার আর কে আছে ? কিন্তু বেচারা জ্যাঠামহাশয়ের বুড়ো বয়সে এই কর্ম্মভোগ !"

বাধা দিয়া জয়ন্তী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ ভাল কথা মনে পড়ল, বাবা কাল বলছিলেন, কাকাবাবুর দেনা পত্তর সব এক এক ক'রে শোধ হয়ে গিয়েছে, আর কাউকে কিছু দেবার নেই। এ মাস থেকে বাড়ী ভাড়ার সব টাকাই তোর হাতে আসবে, তা হলে আর তোর ভাবনা কি ভাই ! একটা মেয়ে মানুষের জন্যে চল্লিশ টাকা কি কম ?"

বেলা এই সুসংবাদে প্রীত হইয়া বলিল, "যথেষ্ট, এবার যদি কোনও গার্লস স্কুলে কাজ পাই তবেই করব বউদি ! নইলে কারুর বাড়ীর দিকে

আর ভুলেও যাচ্ছি না। খুব একটা শিক্ষা হয়ে গেল, আমার কপালে এ বিপত্তি কখ্‌নই ঘট্‌ত না।

বিপত্তি? হ্যাঁ বিপত্তি বইকি? কিন্তু এখানেই কি বিপত্তির পরিসমাপ্তি হইয়া গিয়াছে? চৌধুরী গৃহে শিক্ষকতা করিতে গিয়া বেলার তরুণ জীবনে যে নিদারুণ ক্ষতি হইয়া গেল, তাহা কি এজনমে পূর্ণ হইতে পারিবে? তাহার বিনষ্ট শান্তি হারাণ সুখ সে কি আর সারা জীবনে ফিরিয়া পাইবে? না, কখনই না।

অরুণের অপরিহার্য্য বেদনাময় করুণ স্মৃতি যে বেলার আশামুকুলিত জীবন লতিকায় চিরদিন কাঁটার মতই জড়াইয়া থাকিবে। অরুণের অনির্ব্বাণ প্রেমবহ্নি যে ধিকি ধিকি জ্বলিয়া তাহার অপরিতৃপ্ত তরুণ প্রাণে চিরজীবন অদমনীয় দারুণ মরুতৃষা জাগাইয়া রাখিবে! হায়! বেলার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘটিল? সে না বুঝিয়া কেন এ জ্বলন্ত পাবকে ঝাঁপ দিল? এ জ্বালা এ ব্যথা যে সারা জীবনেও নিবারিত হইবার নহে।

চৌধুরীমহাশয়ের গৃহ হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া, বেলার মন একান্তই ব্যাকুল উদাস হইয়া উঠিল। সে আর কোনও কাজেই মন দিতে পারিতেছিল না।

অরুণকে পাইবার আশা সে ত দুরাশা বলিয়াই জানিত। প্রেমাস্পদকে শুধু এক নিমেষের চক্ষের দেখা দেখিয়াই বেলা এতদিন সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত ছিল। অরুণের মোহন আশার বাণী তাহার প্রেমভরা বুকে একটা মোহ স্বপ্নের সৃষ্টি করিলেও তাহাকে একেবারে আত্মহারা করিতে পারে নাই। তথাপি অরুণের দুর্জ্জয় প্রলোভন হইতে মুক্তি লাভের আশায় তাহার লোভনীয় সংশ্রব পরিহার করিতে সে নিজেই সোৎসুক হইলেও, মুক্তি যখন আপনা হইতে মিলিল, তখনই সে বুঝিতে পারিল, এই মুক্ত হওয়ার মধ্যে কত দুঃখ কতখানি মর্ম্মদাহ প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। অরুণ, তাহার অন্তরের

দেবতা অরুণ, কি গভীর, কি নিবিড়ভাবেই তাহার সমস্ত অন্তরখানিকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে! এখন সেই ক্ষণিকের পাওয়া মিলন ক্ষণ-টুকুতেও বঞ্চিত হইয়া বেলার ব্যথিত প্রাণে একটা ব্যাকুলতা ও হাহাকার স্বতঃই জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার যেন, দিনকাটান ভার হইল। বেলার চিত্তবলের অভাব ছিল না, তথাপি উন্মুখ অধীর চিত্তকে আজ সে কোনও মতেই ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। দিন যেন আর কাটে না, সময় আর ফুরায় না। এমনি অধীরতা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দুটি দিন দুইরাত্রি কাটিয়া গেল। বেলার দুরদৃষ্টক্রমে তাহার একমাত্র সান্ত্বনাদায়িনী অন্তরঙ্গ সখী জয়ন্তীও এসময় অনুপস্থিত। সে শ্বশুর মহাশয়ের সহিত ছেলে মেয়ে লইয়া কি একটা কাজে বালিগঞ্জে ভগিনী-গৃহে দিনকয়েকের জন্য গিয়াছিল। সেজন্য অন্তরের গোপন ব্যথা অন্তরে চাপিয়া বেলা তাহার শূন্য ঘরে একাকিনী যেন পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত সারাক্ষণ ছটফট্ করিতেছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আকাশের একটা প্রান্তে চতুর্থীর বাঁকা চাঁদ খানি তাহার মৃদুক্ষীণ স্নিগ্ধ আলোকে বিশাল ধরণীর বিরাট অন্ধকার রাশি বিদূরিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সেই পরিম্লান পাণ্ডুর জ্যোৎস্না-টুকু যেন মায়াময় মরীচিকার মত দেখাইতেছিল।

উন্মনা বেলা তাহার উতলা অস্থির চিত্তকে একটুখানি অন্যমনস্ক করিবার আশায় কয়দিন পরে সঙ্গীতচর্চ্চায় মন দিবার চেষ্টা করিয়া অর্গ্যানে সুর দিয়া তাহার মধুর কিন্নর কণ্ঠে গাহিতে লাগিল—

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি।
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী!

এসেছিল নীরব রাতে
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী।

* * * *

কেন আমার রজনী যায়
কাছে পেয়ে কাছে না পায়,
কেন গো তার মালার পরশ
বুকে লাগে নি !"

সেই অপরূপ ভাবসম্পদপূর্ণ মধুময় সঙ্গীতের প্রত্যেক শব্দের ললিত ছন্দে গায়িকার আকুল প্রাণের গোপন আক্ষেপোক্তি যেন পরিস্ফুট মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল। বেহাগরাগিণীর আবেগভরা করুণ উচ্ছ্বাসে, যেন তাহারই রুদ্ধ মরমবেদনা ধ্বনিত গুঞ্জরিত হইয়া নির্জ্জন কক্ষখানিকে মোহময় স্বপ্নাবেশে আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

গানের তন্ময়তায় বেলা সেকক্ষে অরুণের উপস্থিতি জানিতেও পারে নাই। বিমুগ্ধ অরুণও সাক্ষাৎ বীণাপাণি রূপিণী সুন্দরী গায়িকার অনবদ্য বিমোহন শ্রী এবং সেই চিত্ত-দ্রবকারী সুধাময় করুণ গানের সুরে এতই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, একান্ত উচিত বোধেও স্বীয় আগমন বার্ত্তা তখন পর্য্যন্ত গৃহাধিকারিণীকে জানাইতে পারে নাই।

পিতার সহিত বিবাদ বিরোধ হইবার পর প্রাণের অসহনীয় যাতনায় ব্যাকুল অধীর হইয়া অরুণ আজ উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদের মত সারাদিন পথে পথে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়াছে। সে আজ পিতার সহিত সকল সম্বন্ধ, সব সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াই আসিয়াছিল, তবু যখনই মনে পড়িতেছিল

হতভাগ্য মাতৃহীন সে, সংসারে একমাত্র অবলম্বন পিতৃস্নেহেও চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার আজন্মের নিরাপদ আশ্রয়স্থল পিতৃগৃহের দ্বার আজ রুদ্ধ—চিররুদ্ধ, তখনই একটা জ্বালাময় তীব্র যাতনা আগ্নেয় গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের মত উৎসারিত হইয়া অরুণের সমস্ত হৃদয় মন দগ্ধ করিয়া দিতেছিল।

সে অন্তর্দাহ যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন একটুখানি শান্তি পাইবার আশায় অরুণ দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া আসিল তাহার কাছে, যাহার জন্য এই অভাবনীয় কষ্ট, অসহনীয় যন্ত্রণা সে ভোগ করিতেছে। যাহার মিলনাশায় সে আজ তাহার সংসারের সকল বন্ধন সকল আকর্ষণ নিঃশেষে কাটাইয়া ধন মান প্রতিষ্ঠা ও গৌরবোজ্জ্বল জীবনের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা হেলায় বিসর্জ্জন দিয়া দুঃখ কষ্ট দৈন্যকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে।

কামনার নিধি মিলিল। আশা পূর্ণ হইল। তরুণী বেলার স্ফুট শারদ জ্যোৎস্নার মত মনোরম পুষ্পিত লাবণ্যলীলা, অরুণের সমস্ত মনক্ষোভ নিবারিত করিল। সেই বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠের মধুর সুধারসে অভিষিক্ত হইয়া তাহার ব্যাকুলিত তাপিত প্রাণের সকল মর্ম্মদাহ যেন নিমেষে জুড়াইয়া গেল। অরুণের মনে হইল তাহার সকল দুঃখ, সকল কষ্ট আজ যেন [illegible] হইয়া গিয়াছে। এই বেলা, এই রূপের রাণী, গানের নির্ঝরিণী বেলা, চিরসঙ্গিনী হইয়া হাসি গানে, আনন্দে প্রেমে যাহার জীবনকে পরিপূর্ণ ও সুখস্বপ্নের মত মধুময় করিয়া রাখিবে, তাহার আর এ পৃথিবীতে কিসের দুঃখ, কিসের অভাব থাকিতে পারে? অরুণের মুগ্ধ চক্ষে তখন সংসারের সমস্ত অস্তিত্ব নিঃশেষে মুছিয়া গেল, রহিল শুধু বেলা। পুলকে প্রেমে বিহ্বল হইয়া সে উচ্ছ্বসিত গদগদ কণ্ঠে ডাকিল, "বেলা! আমি এসেছি বেলা!"

সেই পরিচিত প্রিয়কণ্ঠের ব্যাকুল আহ্বানে সচকিত হইয়া বেলা ত্রস্তে উঠিয়া দেখিল তাহার চির ঈপ্সিত আরাধনার ধন অরুণ বিপর্য্যস্ত কেশবেশ ও ভাব-বিহ্বল নয়নের স্বপ্নময় দৃষ্টি লইয়া তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া। ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ দেখিলেও বেলার যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। সে যেন তাহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

সেই অরুণ, বিপুল রাজ-সম্পদের অধিকারী, ধনীর দুলাল ভাগ্যবান অরুণ আজি কি তাহার দীনকুটীরে সত্যই সমাগত? ইহা কি সম্ভব? তাহাকে নীরব নির্ব্বাক দেখিয়া অরুণ অধৈর্য্য হইয়া পুনশ্চ বলিল, "তুমি আমার অপরাধ নিও না বেলা! তোমাকে আমি না জানিয়ে না বলে এসেছি, কি করি আমার এখন মাথার ঠিক নেই, মনের ঠিক নেই।"

বেলা এবার যেন স্বপ্নঘোর হইতে জাগিয়া উঠিয়া চকিত বিহ্বল স্বরে বলিল, "আপনি? আপনি কখন এলেন, কেমন করে—"

"ব্যস্ত হয়ো না, ভয় পেয়ো না বেলা! আমি আজ তোমার কাছে আসবার অধিকার নিয়েই এসেছি! আমার জীবনের অসফল স্বপ্ন সফল করতে।"

বেলা আজ জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে? ইহা কি অরুণের যথার্থ প্রাণের কথা না প্রেমবিকারগ্রস্ত যুবকের অধীর হৃদয়ের উদ্ভ্রান্ত প্রলাপ-বাণী? কিছুই বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া বেলা যেন বিমূঢ়ের মত তাহার বিস্ময়াকুল দৃষ্টি তুলিয়া অরুণের দিকে অপলকে চাহিয়া রহিল।

তাহার সেই বিহ্বলতাকে অসন্তুষ্টি মনে করিয়া তাহারই পরিত্যক্ত আসনে শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া, অরুণ ক্ষুব্ধ কাতর কণ্ঠে কহিল, "অমন চুপটি করে থেকো না বেলা! কথা কও। আমার দুরবস্থায় তুমি দয়া করো। আমি যে আজ গৃহত্যাগী সর্ব্বত্যাগী হয়ে, আত্মীয় স্বজনের

স্নেহ মমতার বন্ধন জন্মের মত ছিন্ন করে দীন রিক্ত হস্তে এসেছি তোমার দুয়ারে, তোমারই একবিন্দু করুণার প্রত্যাশায়, শরণাগতকে তুমি বিমুখ করোনা বেলা !"

প্রকৃত ব্যাপার বেলা এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। ব্যথিত আহত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল," কেন এমন কাজ করলেন অরুণ বাবু ? আপনার সুখসম্পদভরা দুর্লভ জীবন আপনি এভাবে হীন বিপন্ন করলেন কিসের জন্যে ?"

"তোমার জন্যে—তাও কি আবার বলে জানাতে হবে বেলা ? তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব, আমার সকল দুঃখ মন্থন করা ধন তুমি, তোমার অমৃতময় প্রেমের পরশ দিয়ে আমার সকল ব্যথা তাপ আজ মুছিয়ে দেবে !" বলিতে বলিতে অসম্বরণীয় হৃদয়াবেগে অরুণ বেলার দিকে দুই বাহু প্রসারিত করিল। সেই প্রেমোদ্বেলিত আকাঙ্ক্ষিত বক্ষে আশ্রয় লইবার জন্য বেলার সমস্ত মনপ্রাণ অধীর উন্মুখ হইয়া উঠিলেও লজ্জা, সঙ্কোচ ও সংশয়ের তাড়নায় সে সচকিত হইয়া ত্রস্তে সরিয়া দাঁড়াইল। অরুণের এই সর্ব্বত্যাগী প্রেমে বেলার যেন বিশ্বাস হইতেছিল না,—পুরুষের ভালবাসা কি যথার্থই এমন নিঃস্বার্থ, এমন গভীর হইতে পারে ?

যদি এ উচ্ছল ভালবাসা শুধু মুগ্ধ যুবকের যৌবনের অনিবার্য্য আসক্তি বা রূপজ মোহমাত্র হয়, ভ্রান্ত অরুণ যদি ভবিষ্যতে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া, বেলার পবিত্র নারীত্ব ও হৃদয়ভরা প্রেমকে লাঞ্ছিত করিয়া দুই দিন পরে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তখন দুর্ভাগিনী বেলার অদৃষ্টে কি দশা ঘটিবে ?

বেলার সেই দ্বিধাগ্রস্ত সঙ্কুচিত ভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়া অরুণ ব্যথাদীর্ণ আকুলকণ্ঠে কহিল, "অমন করে' দূরে সরে যেওনা বেলা ! তুমি আমার কাছে, আমার বুকে এসো ! আমি যে আজ আমাদের মিলনপথের সকল

বাধা সব অন্তরায় একেবারে ঘুচিয়ে দিয়েই এসেছি, তবে তোমাকে পাব না কেন?"

বিহ্বলা, বেপমানা বেলার ঘনকম্পিত ওষ্ঠাধর হইতে কষ্টে নির্গত হইল, "বড় ভুল করেছেন, এ ভুলের জন্য আপনাকে চিরজীবন অনুতাপ করতে হবে অরুণবাবু! কিন্তু এ ভুল সংশোধন করবার এখনো সময় আছে, আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে এখনো ফিরতে পারেন।"

অরুণ একটা মর্ম্মভেদী জ্বলন্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "না না, আর ফেরবার উপায় নেই বেলা! সে পথ বন্ধ! বাবা আমাকে ত্যাজ্য-পুত্র করেছেন যে!"

এই মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদে বেলা চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখ হইতে একটা অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি স্বতঃই বাহির হইয়া গেল। বেলা তাহার প্রিয়, প্রিয়তম অরুণকে প্রাণ লুটাইয়া ভালবাসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে এমন ভাবে পাইবার কামনা সে কোনও দিন ভুলিয়াও করে নাই। জীবনারাধ্যের এই সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বভোলা প্রেমের প্রতিদানে বেলা তাহাকে কি দিবে? শুধু জীবনব্যাপী-দুঃখ লাঞ্ছনা আর অবমাননা, না না, বেলা তাহা পারিবে না। আত্মসুখের বশীভূত হইয়া অন্তর-দেবতাকে লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত করিয়া বেলা তাহার নারীহৃদয়ের পবিত্র প্রেমকে এভাবে হীন ও অবমানিত করিতে কখনই পারিবে না। এই জটিল দুর্গম পথ হইতে সে যেমন করিয়া হ'ক তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবে। কম্পিত দেহে, কম্পিত বক্ষে বেলা অরুণের পায়ের কাছে মাটীতে বসিয়া পড়িয়া, সজল করুণ নয়ন দুটী অরুণের পানে তুলিয়া করযোড়ে মিনতি-কাতর কণ্ঠে বলিল, "আপনার দুটীপায়ে পড়ি অরুণবাবু! আপনি এ সংকল্প ত্যাগ করুন। আপনার এত বড় মহৎ জীবনকে এমন করে পথের ধুলোয় লুটিয়ে দেবেন না! আপনি হয়তো এখন ঠিক বুঝতে পারছেন না,

তাই এ অযাচিতে পাওয়া সুখ সৌভাগ্য সম্ভ্রম সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে একটা তুচ্ছ স্ত্রীলোকের জন্যে—"

"তুমি তুচ্ছ; না না বেলা—! তুমি একটী রত্ন, অমূল্য রত্ন! এ রত্ন যে হৃদয়ে ধারণ করাত পারে তার মত সুখী, তার সমান সৌভাগ্যবান সংসারে আর কে আছে? তুমি আমাকে শুধু সেই সৌভাগ্যের অধিকারী, হ'তে দাও বেলা! আর আমি কিছুই চাই না।"

বলিতে বলিতে অরুণ পদতলে উপবিষ্টা বেলার অঞ্জলিবদ্ধ কর দুখানি পরম আগ্রহে ধরিয়া, অধীর মত্ত আবেগে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইল। বেলা এবার আর বাধা দিতে পারিল না। বাঞ্ছিতের প্রেমময় বিশ্বস্ত বক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়া সে নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সে অশ্রু সুখের না দুঃখের?

চমৎকৃত অরুণ বেলার শিশিরসিক্ত শেফালীর মত অশ্রু-আর্দ্র মুখখানি আলোর দিকে তুলিয়া ধরিয়া বিস্মিত ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "একি? তুমি কাঁদছ বেলা? আমি কি তোমাকে না বুঝে ব্যথা দিলুম? তুমি কি আমাকে চাও নি?"

বেলা অরুণের শিথিল বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "এমন ভাবে চাইনি! এ সুখ, এ সৌভাগ্য আমার স্বপ্নাতীত, কিন্তু বিধাতা বুঝি আমাকে তোমার জীবনের অভিশাপ করেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন! আমিই তোমার শনিগ্রহ—" বলিতে বলিতে দুটী বড় বড় অশ্রুবিন্দু বেলার নিটোল গোলাপী গাল দুটিতে শুভ্র মুক্তাফলের মত গড়াইয়া পড়িল।

ব্যথিত অন্তরে অরুণ সযত্নে বেলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া আদর-মাখা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "তুমি আমার শনিগ্রহ? না, না, ও কথা বলো না বেলা! তুমি আমার অন্ধকার জীবনের জ্যোতির্ম্ময় ধ্রুবতারা।

তোমাকে নিয়ে আমি আমার দিশেহারা জীবনকে লক্ষ্যপথে নিয়ে আসব।”

“কিন্তু হয়তো ভবিষ্যতে এমন দিন ও আসতে পারে, যেদিন তোমার মনে এর জন্যে অনুতাপ আস্‌বে, তখন কি আমাকে তোমার জীবনের অভিশাপ, সুখের পথের কণ্টক বলেই মনে হবে না?”

“কক্ষণো না. তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করো বেলা? আমার প্রেমকে এত তুচ্ছ, এত হীন তুমি কেন মনে করছ?”

বেলা অতঃপর অরুণকে আর বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার অশ্রু রেখাঙ্কিত ম্লান মুখে সলজ্জ সুখের আভাস মেঘভাঙ্গা চাঁদের আলোটুকুর মতই চকিতে ফুটিয়া উঠিল। মৃদুকুণ্ঠিত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, “কিন্তু, আচ্ছা বাবা কি আর সত্যই তোমাকে ক্ষমা করবেন না? তুমি যদি—”

“না বেলা! সে আশা নেই, তিনি ক্ষমা করলেও আমি তাঁর ক্ষমা গ্রহণ করতে পারব না। আমি আজ বড় শক্ত—বড় কঠোর শপথ করে ফেলেছি।”

বেলা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, “তাহলে কি করবে এখন?”

“করবার অনেক কিছু আছে বেলা! তার জন্যে তুমি চিন্তা করছ কেন? ভগবান আমার বলবুদ্ধি সমস্তই দিয়েছেন, তারই জোরে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করব, তবে কলেজ ছাড়তে হবে বটে।”

বেলার মুখ পুনরায় বিষণ্ণ হইয়া গেল। সে নীরবে চিন্তাকুল হইয়া রহিল। তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া অরুণ সান্ত্বনা-স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, “বিশ্বাস হচ্ছে না বেলা, বাস্তবিক তুমি কি আমাকে একেবারেই অক্ষম মনে করেছ; কিন্তু এ তোমার মিছে সন্দেহ। যেমন তেমন হউক, চাকরী একটা আমি পাবই, যদি না-ই পাই তাহলে ব্যাঙ্কে আমার নামে যে টাকা

জমা আছে, সেটা আমার নিজস্ব, আমার মায়ের দান, সেই টাকা দিয়ে একটা কোন ও ব্যবসা করতে পারি। তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো।"

ঘরের দেয়াল ঘড়ীতে ঢন্ ঢন্ করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল। চমক-ভাঙ্গা হইয়া অরুণ বলিল, "ন'টা বেজে গেল ; তাহলে আমি এখন আসি বেলা !"

বেলা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে এখন ? বাড়ী—"

"বাড়ী ? বাড়ী আমার আর কোথায় বেলা ? আমি যে এখন নিরাশ্রয়।" বলিতে বলিতে বেলার অপ্রতিভ ব্যথিত মুখের পানে চাহিয়া অরুণ ম্লান করুণ হাসি হাসিল।

সে কথায়, সে হাসিতে বেলার মর্ম্মব্যথা যেন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। মন্দভাগিনী সে, তাহার জন্যই তো আজ এই ধনিনন্দন অরুণ রাজোপম পিতৃভবন হইতে চিরনির্ব্বাসিত আশ্রয়হীন হইয়াছে। হায়! ধিক্! শতধিক্ তাহার এই বিড়ম্বিত অভিশপ্ত নারীজন্মে !

শঙ্কিত চিত্তে, ব্যাকুলকণ্ঠে বেলা বলিল, "তাহলে এই রাতের বেলা, তুমি কোথায় যাবে ? কোথায় থাকবে ?"

"যেখানে যেমন করে হক এ রাতটা যে কাটাতেই হবে বেলা ! তারপর কাল একটা বাসা খুঁজে নিলেই হবে।"

তাহার পর বেলার করুণ সুন্দর মুখখানির পানে সতৃষ্ণ মুগ্ধ কটাক্ষে চাহিয়া সে সহাস্যে বলিল, "তোমার এ ঘরে তো আপাততঃ আমাকে স্থান দিচ্ছনা তুমি ? বিশেষতঃ রাত্রিবাস !"

বেলা অধোমুখে নীরব হইয়া রহিল। অরুণকে সে স্বগৃহে রাত্রি যাপন করিতে বলিবে কেমন করিয়া ? প্রাণে প্রাণে মিলন বা ভালবাসা যতই হউক, একটা সামাজিক বন্ধন না হওয়া পর্য্যন্ত সে প্রিয়তমকে এ অধিকারটুকু দিতে পারে না। নারীর সুনাম যে বড় ভঙ্গুর পদার্থ।

অদৃষ্টক্রমে আজ অবিনাশ বাবুর গৃহেও কেহ নাই, তাঁহারা থাকিলে সেখানে অরুণ স্বচ্ছন্দে এ রাত্রির মত অতিথি হইতে পারিত।

বেলার সেই বিব্রত ভাব দেখিয়া অরুণ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই বেলা! আমি জোর করে তোমার এখানে থাক্‌ব না, কিন্তু যেদিন থাকবার অধিকার নিয়ে আসব, সেদিন তো এমন করে তাড়িয়ে দিতে পারবে না!"

কিন্তু সেদিন কতদূর? যেদিন বেলার এই দীন কুটীর স্বর্গের নন্দন-কাননে পরিণত হইবে, স্বামী স্ত্রীর অকুণ্ঠিত পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া দুটী মিলনপ্রার্থী প্রেমার্ত্ত হৃদয়ের মাঝখানের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন নিঃশেষে ঘুচাইয়া দিয়া তাহাদের প্রেমকে দ্বিধা-সংশয়হীন ও পবিত্র মহান করিয়া তুলিবে, সেদিন, সেই শুভময় মঙ্গল মুহূর্ত্ত আর কতদূর? বেলার ব্যাকুল প্রাণের এই সুগোপন প্রশ্ন তাহার অজ্ঞাতে দুটী কথায় ব্যক্ত হইয়া পড়িল, "কিন্তু, সে কতদিন।"

অরুণ পুলকিত হইয়া, বেলার হাতখানি ধরিয়া, উচ্ছ্বসিত প্রেমে, গভীর স্নেহে উত্তর করিল—"বেশী দিন নয়, সেদিন শীঘ্রই আসবে বেলা! দুটো দিন ধৈর্য্য ধরো। আমাদের জীবন যাপনের একটা কিছু উপায় না করে আমি এতবড় দায়িত্ব কি করে গ্রহণ করি বেলা, আমি যে নিরুপায়, নিরাশ্রয়!" বেলার সুকোমল নারীপ্রাণ প্রেমে করুণায় বিগলিত হইয়া গেল। করুণ স্বরে সঙ্কোচের ভাবে বেলা বলিল, "যতদিন না উপায় হয়, আমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারব তোমার সেজন্যে ভাবনা নেই।"

অরুণ চমৎকৃত হইয়া বলিল, "তুমি? তুমি কেমন করে চালাবে বেলা! একটা সংসার—"

"যেমন করে পারি, এই বাড়ীর ভাড়া যা আসবে, তা'ছাড়া আরো কিছু উপায়—"

অরুণের উচ্ছ্বসিত আদরে সোহাগে বেলা মুখের কথাটাই শেষ করিতে পারিল না। "আঃ! আজ আমার সব দুঃখ, সকল কষ্ট সার্থক হ'ল বেলা! সাধে কি বলি তুমি রমণীরত্ন?"

বেলার সলজ্জ সুন্দরারক্ত মুখখানির দিকে পিপাসিত দৃষ্টিতে চাহিয়া অরুণ ম্লান হাস্যে কহিল, "বিবাহিতা স্ত্রীর 'পরে স্বামীরওতো একটা কর্ত্তব্য আছে বেলা? সে কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করবার শক্তি যতদিন আমার না হয়, ততদিন প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যতই প্রবল হ'ক, তাকে জোর করে দমন করে রাখ্‌তে হবে যে! তোমার এ রাজরাণীর মত রূপ কি ভগবান দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন? তোমাকে তোমার যোগ্য আসনে যতদিন না বসাতে পারি, ততদিন আমাকে যে এ স্বর্গসুখে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত থাক্‌তে হবে বেলা! তাছাড়া তো উপায় নেই।"

অপর্য্যাপ্ত আদরে সোহাগে বেলাকে ভরাইয়া দিয়া অরুণ দৃঢ়কণ্ঠে অবিচলিত স্বরে বলিল, "ধর্ম্ম সাক্ষী, ঈশ্বর সাক্ষী, আজ থেকে তুমি আমার—একান্ত আমারই হ'লে। পৃথিবীর আর কোনও বাধাবিঘ্নই তোমাকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না বেলা!"

তাহার পর বেলার নিকট বিদায় লইয়া সে অনিচ্ছুক মন্থরগতিতে তাহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুগৃহে আশ্রয়ের সন্ধানে চলিয়া গেল। বিমূঢ়া বিমুগ্ধা বেলা, অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি চলে তাহার প্রিয়তমের গমনপথের দিকে সজল নয়নে চাহিয়া রহিল।

হায়রে অদৃষ্ট! দুঃখিনী বেলার চির আকাঙ্ক্ষার ধন, হৃদয় সর্ব্বস্ব অরুণ—যাঁহাকে আজ সে কায়মনোবাক্যে জীবনের উপাস্য দেবতা বলিয়া

বরণ করিয়া লইল তাঁহাকে নিরাশ্রয় ও অভুক্ত জানিয়াও কিনা নিতান্ত নিঃসম্পর্কের মত বিদায় দিতে হইল! এ কি অল্প পরিতাপের বিষয়?

একটা বুকফাটা কাতর দীর্ঘনিশ্বাস বেলার মরমতন্ত্রীগুলিতে দোলা দিয়া কাঁপাইয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে রজনীর অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

এগারো

এবার কুম্ভযোগ উপলক্ষে হরিদ্বারে মহামেলা। তাই পশ্চিমগামী ট্রেণ গুলিতে ইহারই মধ্যে বিষম ভিড় জমিতে আরম্ভ হইয়াছে। পুণ্যকামী নরনারীর দল সময় থাকিতে বাসস্থানের সুবিধা করিয়া লইবার আশায় পূর্ব্বাহ্নেই মেলাস্থলে গমন করিতে ব্যস্ত ও উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। সুতরাং হাওড়া ষ্টেশনে থার্ডক্লাস টিকিট ঘরেই জনতা সবচেয়ে বেশী। বেচারা বুকিং ক্লার্ক ক্রমাগত অবিশ্রান্ত ভাবে টিকিট বিলি করিতেছে।

পশ্চিমগামী লোক্যাল ট্রেণের প্রথম ঘণ্টা যখন পড়িল, তখন সে একটুখানি নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসৎ পাইয়া সদ্য প্রাপ্ত নোট, টাকা পয়সা, যাহা সাবকাশ অভাবে তখনও টেবিলের উপর পড়িয়াছিল, সেগুলি গুছাইয়া যথাস্থানে তুলিতে আরম্ভ করিল।

একখানি পাঁচ টাকার নূতন নোট হাতে তুলিতেই তাহার আকার প্রকার দেখিয়া বুকিং ক্লার্কের মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। এ নোটখানা কি আসল না জাল? বেচারির বয়স অল্প এবং একাজে সে নূতনব্রতী। জাল নোটের কথা সে অনেকের মুখেই শুনিয়াছে এবং দুই চারিখানি প্রত্যক্ষ দেখিবার সুযোগও তাহার জীবনে কয়েকবার ঘটিয়াছে। সেজন্য সে শঙ্কিত হইয়া নোটখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারবার দেখিতে লাগিল। ঠিক! এতো সন্দেহ নয়, এ যে সদ্য সদ্য জাল নোট! কি বিপদ্! এ ব্যাপারে বুকিং ক্লার্ক বাস্তবিক ঘাবড়াইয়া গেল। দুই একটাকা হইলে তবু ভাবনা ছিল না, কিন্তু এযে একেবারে পাঁচ পাঁচটী টাকা থা্‌মোখাই দণ্ড পড়িল, কতই বেতন তাহার? মাথায়

হাত দিয়া বসিয়া এ নোটখানা কাহার কাছে পাইয়াছে সে তাহাই স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দিনে দুপুরে তাহাকে প্রতারিত করিয়া, ভিড়ের মধ্যে তাহার চক্ষে ধূলি দিয়া এ জাল নোটখানি কে তাহাকে গছাইয়া গেল, কে সে? কখন আসিল? ভাবিতে ভাবিতে চকিতে একটা লোককে তাহার মনে পড়িল, একজন মাড়োয়ারী ধরণের মলিন পরিচ্ছদধারী হিন্দুস্থানী লোক যে এই মিনিট কয়েক পূর্ব্বে একখানা আসানসোলের টিকিট লইয়া গিয়াছে, এ নোটখানি যেন সেই দিয়াছিল,—হাঁ, সেই দিয়াছে বই কি? সেই তাহার মাথা খাইয়াছে! কিন্তু চেষ্টা করিলে এখনও তাহাকে ধরা যায় নাকি?

কথাটা মনে পড়িতেই বুকিং ক্লার্ক এক লম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আর এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট না করিয়া টিকিট ঘরের জানালা ও দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্ল্যাটফরমের দিকে ছুটিল। তখন গাড়ীর শেষ ঘণ্টা বাজিতেছিল এবং অগণিত যাত্রীর গুরুভার আর বহিতে না পারিয়াই যেন তাহার পরিচালক এঞ্জিন্ তীব্র হুইসেলে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছিল। থার্ড ক্লাসগুলি সর্ব্বশেষে, প্ল্যাটফরমের জনতা ব্যূহ ভেদ করিয়া বুকিং ক্লার্ক যখন সেই দিকে আসিয়া পৌঁছিল, তখন একখানা থার্ডক্লাস কামরায় সে দেখিতে পাইল সেই লোক! থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে জানালা দিয়া ভাল করিয়া দেখিল, হাঁ, ঠিক, লোকটা সেই বটে, আধাবয়সী, কাঁচায় পাকায় বড় বড় চোম্‌রা গোঁফ, আহম্মকের মত চেহারা মাথায় লালচে রংয়ের পাগড়ী মাড়োয়ারী ধরণে বাঁধা, পরণে একখানি ময়লা ধুতি আর মোটা খদ্দরের একটা অর্দ্ধ মলিন লম্বা পিরাণ, এই ত এ-ই মাত্র নোটখানা তাহাকে দিয়া আসিয়াছে। বুকিং ক্লার্ক শশব্যস্তে তাহার কাছে গিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হাঁকিল, "ওহে শুনছ?"

লোকটা তখন যাত্রীপূর্ণ কামরায় একপ্রান্তে প্ল্যাটফরমের দিকের

জানালার কাছে একটুখানি জায়গা করিয়া লইয়া সুস্থির চিত্তে একটী ছোট্ট কলিকায় ছেঁড়া ন্যাকড়ার সাহায্যে বহুকষ্টে তামাক ধরাইয়া তাহাতে টান দিবার জন্য সবে মাত্র মুখের কাছে তুলিয়াছিল। এমন সময় বুকিং ক্লার্কের কর্কশ কণ্ঠের ডাক শুনিয়া চমকিত হইয়া সে জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে বলছ ?"

"হ্যাঁ তোমাকে !"

পাদানের উপর দাঁড়াইয়া সেই পাঁচ টাকার নোটখানা তাহার সম্মুখে ধরিয়া বুকিং ক্লার্ক ত্বরিত স্বরে জিজ্ঞাসিল, "এ নোটখানা এখনি টিকিট ঘরে তুমিই আমাকে দিয়েছিলে না ?"

"হ্যাঁ কেন ?"

আর কিছু বলিবার কহিবার সময় তখন ছিল না। ট্রেণখানি দীর্ঘ পথযাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া বিকট হুঙ্কার করিয়া দুলিয়া উঠিয়াছে। বুকিং ক্লার্ক তৎক্ষণাৎ লোকটার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া একেবারে প্ল্যাটফরমে নামাইয়া ফেলিল। লোকটা সে টানের বেগে নিজে কোনও মতে টাল সামলাইয়া পড়িতে পড়িতে বাঁচিল বটে, কিন্তু হাতের পুঁটুলিটী স্থানভ্রষ্ট হইয়া ভূমে পতিত হইল এবং তামাকু সমেত কলিকাটীও ঠিকরাইয়া প্ল্যাটফরমের উপর পড়িয়া বিখণ্ডিত হইয়া গেল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। চলন্ত গাড়ীর কামরা হইতে অনেক জোড়া কৌতূহলী চক্ষু নির্য্যাতিত ব্যক্তির পানে চাহিয়া রহিল।

বুকিং ক্লার্কের এই অতর্কিত আক্রমণে সে লোকটা এতই আশ্চর্য্য ও হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার মুখে সহসা বাক্য নিঃসরণ হইল না। মিনিট খানেক অবাক্ হইয়া আক্রমণকারীর পানে চাহিয়া থাকিয়া পুঁটুলিটী সযত্নে তুলিয়া, ধূমায়িত দহ্যমান তাম্রকূট সহিত পতিত ভগ্ন

কলিকাতার দিকে সতৃষ্ণ, সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিরক্তি তিক্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কে বাবা তুমি ? গরীবের ওপর জোর জুলুম করে টেনে হিঁচড়ে, গাড়ী থেকে নামিয়ে নেবার কি দরকার ছিল ? গরীবের অপরাধ, কোম্পানীকে গাঁটের পয়সা দিয়ে তবে তো গাড়ীতে উঠেছিলুম, এই তো জল জ্যান্ত টিকিট কেনা রয়েছে, দেখ না ?"

মাড়োয়ারী টিকিট দেখাইবার জন্য পকেটে হাত দিতে গেল, কিন্তু বুকিং ক্লার্ক বাধা দিয়া তাহার হাত ধরিয়া প্লাটফরম হইতে কিছু দূরে একান্তে টানিয়া আনিল। ধৃত লোকটা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল না, সে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া "কি বাবা! ব্যাপার কি ; একি মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি ?" বলিতে বলিতে বিনা আপত্তিতে বুকিং ক্লার্কের সঙ্গে চলিয়া আসিল। তামাসা দেখিবার জন্য অচিরে সেখানে বিস্তর ভিড় জমিয়া গেল। বুকিং ক্লার্ক একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারীকে পুলিশ ডাকিতে বলিতেই ধৃত ব্যক্তি বিষম আতঙ্কে যেন আঁৎকাইয়া উঠিল। তাহার সে বিরক্ত ও উগ্রভাব একেবারে তিরোহিত হইল।

বুকিং ক্লার্কের দিকে কাতরভাবে চাহিয়া সে বলিল, "আবার পুলিশ ডাক কেন বাবা! আমার অপরাধ ; আমি চোর না ডাকাত ?"

"অপরাধ না পেলে তোমাকে খামোকা গাড়ী থেকে টেনে আনবো কেন ? বুকিং ক্লার্ক পকেট হইতে সেই নোটখানা পুনরায় বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ নোট তুমিই আমাকে দিয়েছ তা স্বীকার করছ ত ?"

"হ্যাঁ, তা করব না কেন ; নোট না দিলে টিকিট পেতাম কোথায় ? আমি এমন বেইমান লোক নই মশায়! যে বিনা টিকিটে গাড়ীতে উঠব। হুঁ, নোট দিয়েছি তাতে হয়েছে কি ? এও কি একটা অপরাধ ?"

"এ নোট জাল।"

মাড়োয়ারী চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "সেকি ? না না, তুমি ভুল করছ বাবা ! ভাল করে দেখ দেখি ।"

"দেখেছি, আসল আর নকলে একটু ত তফাৎ থাকবেই । এ নোট সত্য সত্য জাল ।"

লোকটার বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে এবার ব্যাকুলতার চিহ্ন স্পষ্টই জাগিয়া উঠিল, তাহার চেহারা যেন মরার মত ফ্যাঁকাসে বিবর্ণ হইয়া গেল। আর্ত্ত বিপন্ন কণ্ঠে সে, "অ্যাঁ ! তাই না কি ; ও বাবা ! তবেই তো আমি গেছি একেবারেই গেছি ।" বলিতে বলিতে স্তম্ভিতের মত মাথায় হাত দিয়া ধপ্ করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে পুলিশকর্ম্মচারী তাঁহার দলবল সহিত ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন। ব্যাপার শুনিয়া ও ধৃত ব্যক্তির ভাবগতিক দেখিয়া তিনি তাহাকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া জেরা আরম্ভ করিলেন। মাড়োয়ারী প্রায় কাঁদকাঁদ হইয়া করযোড়ে সকাতরে বলিল, "দোহাই ধর্ম্মাবতার ! আমি গরীব নির্দ্দোষী, "এ জাল সাজীর কিছুই জানি না। আপনি দয়া করে আমাকে এ বিপদে বাঁচান, আমাকে রেহাই দিন ।"

পুলিশ কর্ম্মচারী তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন "ভয় নেই, তুমি যদি বাস্তবিক নির্দ্দোষী হও, তাহলে রেহাই আপনিই পেয়ে যাবে। এখন আমি যা জিজ্ঞাসা করি. তার তুমি ঠিক ঠিক উত্তর দেও দেখি মিথ্যা বলো'না, খবরদার ।"

" না হুজুর ! মিথ্যা বলবার বান্দা এ রামশরণ নয় !

"তোমার নাম বুঝি রামশরণ ? আচ্ছা রামশরণ ! তুমি এ নোটখানা কোথায় কার কাছে পেয়েছ তা সত্যি করে বল দেখি ।"

" এই ষ্টেসনেই পেয়েছি হুজুর! একজন ভদ্রলোকের কাছে, আমার

কাছে যে একখানা দশ টাকার নোট ছিল, সেখানা আমি ভাঙ্গিয়ে ছিলুম।

পুলিশ কর্ম্মচারী, "তুমি কেমন করে বুঝলে তিনি ভদ্রলোক?"

রামশরণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সে বুঝা আর মুস্কিল কি মশাই? তাঁর রাজপুত্তুরের মতন সুন্দর চেহারা, আর জমকাল দামী পোষাক দেখে কে না বুঝবে তিনি একজন ভদ্রলোক—কেবল ভদ্রলোক নয়, বড় লোক।"

"কি পোষাক তিনি পরেছিলেন তোমার মনে আছে?

"আজ্ঞে আছে বৈকি; যদিও তাড়াতাড়িতে আমি তাঁকে ভাল করে দেখিনি, তবু আমার বেশ মনে পড়ছে তাঁর পরণে ছিল একটা নীল্‌চে রংয়ের কালো সার্জ্জের কোট, আর সাদা ফ্লানেলের লম্বা প্যাণ্টলুন। বুকে এই মোটা গিনি সোণার গার্ড চেন! আর নোট দুখানা যখন তিনি আমার হাতে দিলেন, তখন স্পষ্টই দেখলুম তাঁর হাতের আঙ্গুলে হীরের আংটী ঝক্ ঝক্ করছে। আমি গরীব হলেও সে জিনিস চিনি হুজুর, তার দাম বড় অল্প নয়—"

পুলিশ কর্ম্মচারী বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুখানা? দুখানা নোট তুমি পেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ হুজুর! আমার দশ টাকার নোটের বদলে দুখানা পাঁচ পাঁচ টাকার নোট তিনি আমাকে দিয়েছিলেন—"

"অন্যখানা তোমার কাছেই আছে? কই বার করো দেখি?"

রামশরণ তাহার পিরাণের পকেট হইতে একটা ময়লা লাল রংয়ের "বটুয়া" বাহির করিল, তাহার মধ্যে বুকিং ক্লার্কের প্রাপ্ত নোটের অনুরূপ আর একখানি নোট ও সিকি দুয়ানি, এবং কয়েক আনা পয়সা ছিল মাত্র। নোট দুখানি মিলাইয়া সকলে দেখিলেন দুইখানা নোটই জাল।

রামশরণ ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "এ নোটখানিও জাল ?"

"তা বইকি, দেখছ দুটী অবিকল এক ছাঁচে ঢালা।"

"হে ভগবান্! তাহলে গরীবের দশা কি হবে ?" রামশরণ অতি কাতর ভাবে একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

পুলিশ কর্ম্মচারী তাহার কাতরতায় দৃকপাত না করিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, "এরকম নোট তোমার কাছে আরো আছে নাকি ? যদি লুকিয়ে রেখে থাকো—"

"না হুজুর! লুকোবো কেন ? শুধু এই নোট আর এই গণ্ডাকতক পয়সা ছাড়া আমার কাছে এখন আর কিছুই নেই—আমি একেবারে নিঃসম্বল! বিশ্বাস না হয় আমি আপনাকে আমার সমস্তই দেখিয়ে দিচ্ছি।" রামশরণ তখন চোখের জল মুছিতে মুছিতে এবং বারম্বার ধর্ম্ম ও পুলিশ হুজুরের দোহাই দিতে দিতে তাহার সঙ্গের সম্বল সেই কাপড়ের পুঁটলী সকলের সাক্ষাতে খুলিয়া ফেলিল। পরণের আঙ্গরাখা ও পাগড়ীও ঝাড়িয়া দেখাইল, কিন্তু তাহার কাছে আর সন্দেহজনক কোন বস্তুই দেখিতে পাওয়া গেল না। পুলিশের কাজ শেষ হইলে আসামীকে থানায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। রামশরণের সৌভাগ্যক্রমে এই জাল নোটের মামলার তদন্ত করিবার ভার অতঃপর যাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল, তিনি একজন নামজাদা ডিটেক্‌টিভ্, তাঁহার নাম মিষ্টর এস্, এন্, বোস। এই বোস সাহেব লোকটী বড় উপযুক্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। গোয়েন্দাগিরি কার্য্যে তিনি মাথার চুল পাকাইয়াছেন, এবং অভিজ্ঞতা, সুনাম, অর্থও অর্জ্জন করিয়াছেন যথেষ্ট। মিঃ বোস যখন যে মামলা হাতে লইয়াছেন, তাহার একটা নিষ্পত্তি না করিয়া ছাড়েন নাই এবং তাঁহার আশ্চর্য্য দক্ষতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে প্রকৃত দোষী-ব্যক্তি

শাস্তি পাইয়াছে এবং নির্দ্দোষী মুক্তিলাভ করিয়াছে। এ কারণে ডিটেক্‌টিভ্ বোসের নাম সে অঞ্চলে বেশ একটু বিখ্যাত হইয়া গিয়াছিল।

মিঃ বোস আসিয়া আসামী রামশরণের সহিত একান্তে দেখা করিলেন। তাহাকে এবিপদে সাহায্য দিবার জন্যই তাঁহার আগমন একথাও জানাইলেন।

রামশরণ তাঁহার সাক্ষাতে কাঁদিয়া ফেলিল, করযোড়ে মিনতি করিয়া সে কাতর স্বরে বলিল, "গরীবকে বাঁচান হুজুর! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি এ জাল সাজির কিছুই জানি না, আমি নির্দ্দোষ।"

ডিটেক্‌টিভ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কিন্তু তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে না পারলে ত তুমি ছাড়ান পাবে না, সেইজন্যেই আমি এসেছি। তুমি দোষী কি নির্দ্দোষী সেটা খোঁজ তল্লাস করে আমাকেই প্রমাণ করতে হবে। আচ্ছা, এখন বল দেখি তুমি পুলিশের কাছে যা যা বলেছ, তাকি সত্যি?"

"হ্যাঁ সাহেব!"

মিঃ বোস তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন—"সমস্তই সত্যি? তুমি ঠিক বলছ? দেখো! আমার কাছে সব ঠিক করে না বল্লে আমি এখন কিছুই করতে পারব না।"

রামশরণ এবার আরও ভীত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। সে একবার এদিক ওদিক চাহিয়া, মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া ভয়ে ভয়ে নিম্ন স্বরে বলিল, "আপনার কাছে আর লুকোবো না,—আমি শুধু একটা কথা মিছে বলেছি হুজুর! কিন্তু দায়ে পড়ে।"

"কি কথা?"

"আমার নাম আমি তখন রামশরণ বলেছিলাম, কিন্তু আসলে তা নয়—"

"তবে কি ?"

"আমার আসল নাম দীনদয়াল—"

"তুমি যদি নির্দ্দোষী, তবে এরকম করে নাম ভাঁড়িয়েছিলে কেন ?"

দীনদয়াল বিষণ্ণ মুখে বলিল, "ঐ ত বললুম হুজুর ! নাম ভাঁড়িয়ে ছিলুম কি সাধে ? বড় বিপদে পড়েই আসল নাম লুকিয়ে নকল নাম নিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি অতি হতভাগা হুজুর !" বলিতে বলিতে দীনদয়াল একটা কাতর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার ম্রিয়মাণ শঙ্কিত মুখে মনক্ষোভ ও কষ্টের চিহ্ন স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া গেল।

মিঃ বোস তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দীনদয়াল ! তুমি ভেবো না, আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু তুমি তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত আমার কাছে খুলে বল, কিছুই লুকিও না। সব না জানলে আমি তদবির করব কেমন করে ?"

"না হুজুর ! আপনার কাছে আমি একটী কথাও চেপে রাখবো না সমস্তই বলছি। আমার অবস্থা চিরদিন এমন ছিল না ; বরোদায় একটা ব্যবসা ফেঁদে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করছিলুম, সংসারের খরচ খরচা বাদে কিছু টাকা জমাও করতে পেরেছিলুম, কিন্তু কপালের ভোগ যাবে কোথায় ? কারবার ফেল হয়ে গেল। সে ধাক্কা সামলাতে জমা পুঁজি ত সব গেলই, তা'র উপর দেনা পত্তর বিস্তর হয়ে দাঁড়াল। দেনদারদের জ্বালায় ঘরে তিষ্ঠানো দায় হয়ে উঠল। তাদের দৌরাত্ম্যে অস্থির অতিষ্ঠ হয়ে শেষে দেশ ছেড়ে, ঘর ছেড়ে যে দিকে দুই চক্ষু যায় সেই দিকে বেরিয়ে পড়লুম। তার পর আর কি বলব সাহেব ! সেই অবধি নিজের মাথার ঘায়ে পাগল হয়ে হয়ে কুকুরের মতন আজ এখানে কাল সেখানে মারে,

মারে, বেড়াচ্ছি। কোনও খানে দশটা দিন জমে থাকতে ভরসা হয় না, পাছে তারা সন্ধান পেয়ে ধাওয়া করে এসে—”দীনদয়াল পুনরায় নিশ্বাস ফেলিল।

মিঃ বোস লোকটার কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাইলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি ষ্টেশনে যে ভদ্রলোকটার কাছে নোট ভাঙ্গাতে গিয়েছিলে, তিনি কি তোমার চেনা লোক?”

দীনদয়াল তালুতে জিহ্বা সংযোগে একটা শব্দ করিয়া বলিল, “রামঃ! তাকে আমি এর আগে কখনো চক্ষেও দেখিনি হুজুর! চেনা ত দূরের কথা।”

“তবে তুমি তাঁরই কাছে নোট ভাঙ্গাতে গেলে কেন?”

“সাধে কি গিয়েছিলুম সাহেব! টিকিটবাবু যখন আমার দেওয়া দশ টাকার নোটখানা আবার আমার হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন তাঁর কাছে এখন চেঞ্জ নেই তার জন্যে একটুখানি অপেক্ষা করতে, তখন অপেক্ষা করবার আর বেশী সময় ছিল না, গাড়ী ছাড়তে আর দেরী নেই। কাজেই গাড়ী ফেল্ হবার ভয়ে আমি একেবারে অস্থির হয়ে উঠলুম। যদি কোনও চল্‌তি মুসাফেরের কাছে নোটখানা ভাঙ্গিয়ে নিতে পারি, সেই চেষ্টায় আমি যখন ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, সেই সময়ে তাঁ’র সঙ্গে আমার দেখা হল।”

“তিনি তখন কোথায় ছিলেন? কি করুছিলেন? তাঁ’র সঙ্গে আর কেউ ছিল কি?”

“কেউ না। সেই টিকিট ঘর থেকে খানিক তফাতে তিনি একলাটী মুখে সিগারেট দিয়ে প্যাণ্টুলুনের পকেটে হাত রেখে, দিব্যি বেপরওয়া ভাবে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর ধরণ ধারণ দেখে আমার প্রথমটা মনে হয়েছিল সাহেব, কিন্তু তারপর কথা শুনে বুঝতে পারলুম তিনি বাঙ্গালী।”

"তাঁর বয়স কত আন্দাজ করতে পারো ?"

"বছর চব্বিশ পঁচিশের বেশী হবে না বোধ হয়, খাসা সুন্দর লম্বা চৌড়া জোয়ান পুরুষ।"

"তুমি নোট ভাঙ্গাতে চাইলে সেই ভদ্রলোকটী কি বল্লেন ?"

"বল্লেন আমার কাছে টাকা ত নেই পাঁচ পাঁচ টাকার দুখানা নোট আছে—তাই নেবে ?"

আমি হ্যাঁ বলতেই তিনি তাঁড়াতাড়ি কোটের বুক পকেট থেকে দুখানা নোট বার করে দিলেন, তার একখানা বুকিং ক্লার্ককে দিয়ে আমি আসানসোলের একখানা টিকিট আর ক'গণ্ডা পয়সা ফেরত পাই, তাই নিয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে মহা মুস্কিলে একখানা গাড়ীতে উঠে সবে একটু জায়গা করে বসেছি, ইতি মধ্যে এই বিভ্রাট !"

দীনদয়ালের একথাগুলিও মিঃ বোস নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিলেন, লোকটার আকৃতি প্রকৃতি ও কথাবার্ত্তায় তাহাকে নেহাত সাদা সিদা ও ভাল মানুষ বোধ হইল। তিনি আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা দীনদয়াল ! ঐ দশ টাকার নোটখানা ছাড়া তোমার কাছে কি টাকা কড়ি আর কিছুই ছিল না ?"

"না সাহেব ! এ নোটখানা আমার হাতে আসবার আগে, আমার হাত যে একেবারেই খালি ছিল। কাল পয়সা অভাবে শুধু ছাতুখেয়ে দিন কাটিয়েছি। আশ্রয় অভাবে পথে বসে রাত কাটিয়েছি,—আমার দুঃখের দুর্গতির কথা আর কত বলব হুজুর," বলিতে বলিতে বিপন্ন দীনদয়ালের চক্ষে বাস্তবিক জল আসিয়া পড়িল।

মিঃ বোস বলিলেন, "সে দশ টাকার নোটখানি কার কাছে পেয়েছিলে ?"

"ডাক ঘরে—আমার ছোট মেয়ে ইন্দোর থেকে আমার নামে দশ টাকা মণিঅর্ডার করেছিল।"

"মণিঅর্ডার তোমার আসল নামেই এসে ছিল তো ?"

"হ্যাঁ হুজুর, আসল নামেই, আমার মেয়ে আমার নকল নাম জানেও না।"

"মণিঅর্ডার পেয়ে তুমি কি করলে ?"

"সোজা ষ্টেশনে চলে এলুম। আসানসোলে যাবার জন্যে আমি ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম। কেবল হাতে পয়সা কড়ি ছিল না, তাই এখানে কদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।"

"আসানসোলে তুমি কেন যাচ্ছিলে সেখানে কি তোমার কোনও আত্মীয়—"

"আমার বড় মেয়েটী আছে, জামাই সেইখানেই কাজ কর্ম্ম করেন কি না, সেখানে যে কটা দিন কাটাতে পারি, সেই আমার পরম লাভ। আমার এখন কি আর কোনও কিছু ঠিক ঠিকানা আছে হুজুর ?"

লোকটার দুরবস্থায় মিঃ বোসের মনে করুণার উদ্রেক করিল। তাহার নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কোনও প্রমাণ না পাইলেও মিঃ বোসের মনে স্বতঃই ধারণা জন্মিল যে, এই দীনদয়াল নির্দ্দোষ। তিনি দীনদয়ালকে মিষ্ট বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া এবং শীঘ্রই খালাস পাইবার ভরসা দিয়া সত্য মিথ্যা জানিবার জন্য প্রথমে পোষ্ট অফিসে গমন করিলেন। সেখানে খোঁজ করিয়া জানিতে পারিলেন, দীনদয়ালের নামে সেদিন ইন্দোর হইতে বাস্তবিকই দশ টাকার মণিঅর্ডার আসিয়া ছিল এবং লোকটা নিজে আসিয়া পোষ্টাফিস হইতে মণিঅর্ডারের টাকা লইয়া গিয়াছে।

তার পর ষ্টেশনে গিয়া সেই বুকিং ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে

পারিলেন, দীনদয়ালের কথাই সত্য, সে যখন দশ টাকার নোট দিয়া টিকিট খরিদ করিতে যায়, তখন বুকিং ক্লার্কের হাতে চেঞ্জ না থাকায় সে লোকটাকে যথার্থই অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। এই ঘটনায় ডিটেক্‌টিভের মনে স্থির প্রতীতি জন্মিল দীনদয়াল এ জাল নোটের মামলার কিছুই জানে না। সে ভাগ্যদোষে এঘটনায় জড়িত ও ধৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত দোষীর সন্ধান না করিতে পারিলে এই নির্দ্দোষী লোকটীকেই নিরপরাধে অপরাধীর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে ইহাও বুঝিতে পারিলেন।

বারো

দিন কয়েক পরে পুনরায় সেইরূপ জাল নোটের আবার একটী অভিযোগ আসিল। ফরিয়াদী একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক। তিনি নোটখানি রেলওয়ে বুকিং অফিস হইতে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। দুইবার দুইখানি নোটই ষ্টেশন হইতে পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং মিঃ বোস মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন এই জালিয়াৎ যেই হউক্ তাহার প্রধান লীলা-ক্ষেত্র রেলষ্টেশন। ষ্টেশনের অশ্রান্ত জনতা ও ব্যস্ততার মধ্যে নিরীহ বিদেশী যাত্রীদিগকে ঠকাইয়া জাল নোট চালান করিবার বেশ সুবিধা, সেইজন্যই লোকটা এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। অতএব অপরাধীকে ধরিতে হইলে প্রথমে ষ্টেশনের দিক হইতেই অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হইবে।

ডিটেক্‌টিভ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা এমন কি সময় সময় রাত্রেও ছদ্মবেশে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য রহিল বুকিং অফিসগুলির দিকে।

মেলার দিন আসন্ন। জনতা ক্রমেই চঞ্চল উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। সুবিস্তীর্ণ বৃহৎ রেলষ্টেশনখানি অগণিত তীর্থযাত্রীদের পদভরে কম্পিত, যেন সদা সর্ব্বদাই গম্ গম্ রম্ রম্ করিতেছিল।

মেল, এক্সপ্রেস, প্যাসেঞ্জার এমন কি সময়ে সময়ে মালগাড়ীও নিম্ন শ্রেণীর আরোহিগণকে বহন করিয়া গন্তব্যস্থলে ছুটিতেছে। রেলের কর্ত্তৃপক্ষরা ট্রেণের সংখ্যা অতিরিক্ত করিয়া দিয়াও আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

অপরাহ্ণের দিকে মিঃ বোস হাতে একটা গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ লইয়া

যাত্রীরূপে থার্ডক্লাস বুকিং অফিসের দিকে ঘুরিতেছিলেন। হাওড়া এক্সপ্রেসখানি এখনই ছাড়িবে। তাই টিকিট ঘরে বিষম হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই আগে টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। বেচারা বুকিং ক্লার্ক আর যেন টিকিট বিলি করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, ভিড়ের ঠেলায় সে ব্যতিব্যস্ত গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া গিয়াছিল। টিকিট প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গেল, তথাপি ভিড় কমিল না। সুতরাং নিরুপায় হইয়া অবশিষ্ট যাত্রীদের পরের ট্রেণে যাইতে উপদেশ দিয়া বুকিং ক্লার্ক খিড়কী বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহারা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া অগত্যা রেলওয়ে কোম্পানীকে গালি দিতে দিতে কেহ বা ঘরে ফিরিয়া গেল, কেহ বা পরের ট্রেণ ধরিবার আশায় মুসাফির খানায় অপেক্ষা করিতে গেল।

মিঃ বোসও এবার স্থানান্তরে গমনোদ্দেশে সবে মাত্র পা বাড়াইয়াছেন, এমন সময় টিকিট ঘরের দরজা খুলিয়া একজন কেরাণী ব্যস্ত সমস্ত ভাবে আসিয়া কহিল," মিঃ বোস! আপনি আছেন? এই দেখুন আবার আর একখানা জাল নোট এসেছে।"

নোটখানি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া মিঃ বোস দেখিলেন, ঠিক সেই রকম পাঁচ টাকার নোট। কি আশ্চর্য্যের কথা! তাঁহার সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া সে দুর্বৃত্ত ইহারই মধ্যে কখন এ জাল নোট চালান করিয়া গেল; দুর্বৃত্ত হউক তথাপি ডিটেক্‌টিভ তাহার আশ্চর্য্য কৌশল ও তৎপরতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ নোটখানা যে দিয়েছিল, তাকে আপনি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ দেখেছি নিশ্চয়, কিন্তু কতটুকু সময়ের জন্য! এক সেকেণ্ডও হবে না বোধ হয়।"

"এখন দেখ্‌লে চিন্‌তে পারবেন কি ?"

"বোধ হয় না, ঐ বিষম ভিড়ের মধ্যে প্রত্যেক যাত্রীদের দিকে লক্ষ্য রাখা সম্ভবপর নয়, তবে লোকটা বেশ লম্বা চওড়া, আর পোষাক পরিচ্ছদও বেশ ভদ্রলোকের মত সাহেবী ধরণের ছিল, শুধু এই টুকুই মনে পড়ছে।"

মিঃ বোস আর বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্লাটফর্ম্মের দিকে ছুটিলেন। ট্রেণের কাছাকাছি গিয়া থার্ডক্লাসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন, কিন্তু সে কামরাগুলি সমস্তই নিম্নশ্রেণীর আরোহীতে পরিপূর্ণ। তাহাতে ভদ্রলোকের সংখ্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইণ্টার ও সেকেণ্ড ক্লাস ও দেখা হইল, কিন্তু সেখানে এমন কোনও লোককে দেখিতে পাইলেন না, যাহাকে সন্দেহ করা চলে।

অবশেষে একখানা ফার্ষ্টক্লাস কম্পার্টমেণ্টের কাছে আসিয়া একজন ভদ্র যুবককে দেখিতে পাইলেন, যাহার আকৃতি ও পরিচ্ছদ কেরাণী এবং দীনদয়াল বর্ণিত ভদ্রলোকের সাদৃশ্যের সহিত মিলিল। তাহার পরিধানে দামী গরম কাপড়ের হাল ফ্যাসানের স্যুট, মাথায় হ্যাট, বুকে সোণার চেন এবং দুটী আঙ্গুলে দুটী বহুমূল্য উজ্জ্বল হীরকাঙ্গুরী ঝল্‌মল্‌ করিতেছে।

সেই গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ যুবককে সাহেবী পোষাকে প্রথমটা ইউরোপীয়ান বলিয়া ভ্রম হইলেও মিঃ বোস তাহার মুখের গঠন ও কৃষ্ণতার চক্ষু দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, সে ইংরাজ নহে বাঙ্গালী। কিন্তু অমন একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে সহসা জালিয়াৎ বলিয়া সন্দেহ করা যায় কেমন করিয়া, বিশেষতঃ সে আবার প্রথম শ্রেণীর আরোহী। মিঃ বোস তখন বুদ্ধি খাটাইয়া একজন টিকিট চেকারকে ডাকিয়া কৌশলে সেই ভদ্রলোকটীর টিকিট দেখিতে বলিলেন। টিকিট-চেকার

টিকিট দেখিতে চাহিলে চকিতের জন্য সেই যুবকটীর মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া পকেট হইতে মরক্কো লেদারের সুন্দর একটী ব্যাগ বাহির করিয়া তন্মধ্যে রক্ষিত টিকিট লইয়া টিকিট চেকারের সম্মুখে ধরিলেন। টিকিটখানি হরিদ্বারের, কিন্তু ফার্ষ্ট ক্লাসের নহে থার্ডক্লাসের। থার্ডক্লাসের টিকিট লইয়া ফার্ষ্টে কেন উঠিয়াছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে লোকটী বেশ নির্ভীক সপ্রতিভ ভাবে জানাইলেন, ষ্টেশনের অসম্ভব ভিড় ব্যস্ততার মধ্যে তিনি ভুল ক্রমে থার্ড ক্লাসের টিকিট লইয়া ফেলিয়াছেন, পরিবর্ত্তনের আর সময় নাই, তাই পরবর্ত্তী কোনও বড় ষ্টেশনে অথবা গন্তব্য স্থলে পঁহুছিয়া এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইবেন। প্রকৃত পক্ষে গাড়ী ছাড়িতে আর বিলম্ব ছিল না। তখন শেষ ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে এবং গার্ড তাহার সিটি বাজাইয়া সবুজ নিশান দেখাইতেছে। অতঃপর আর ভাবিবার বা ইতস্ততঃ করিবার একটুও সময় ছিল না। সুতরাং মিঃ ঘোস কপাল ঠুকিয়া সেই গাড়ীতেই উঠিয়া পড়িলেন। আসবাবের মধ্যে সেই গ্ল্যাডষ্টোন্ ব্যাগ তাঁহার সুদীর্ঘ পথযাত্রার একমাত্র সম্বল। তন্মুহূর্ত্তেই গাড়ীখানা হুস্ হুস্ শব্দে চলিতে আরম্ভ করিল।

কামরার অপর দিকে দুইখানি বেঞ্চ ও কোচ অধিকার করিয়া একজন শ্বেতাঙ্গ সস্ত্রীক, সপুত্রকন্যা বসিয়াছিলেন। ষ্টেশনের দিকের বেঞ্চে সেই বাঙ্গালী যুবক একাকী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গের আসবাব একটা বিলাতী কম্বলে জড়ানো ছোট্ট বেডিং এবং সুটকেস যথাস্থানে রক্ষিত। লম্বা দামী ওভার কোটটা র‍্যাকে টাঙ্গানো। মিঃ বোস ব্যাগটী হাতে লইয়া সেই বেঞ্চেরই অপরপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। যুবক তাঁহার দিকে দৃক্‌পাতও করিল না। বেঞ্চের গদিতে ঠেসান দিয়া চরণদ্বয় প্রসারিত করিয়া সে তখন পরম আয়াসে বসিয়া সিগারেট ধরাইতেছিল। গাড়ী চলিতে

লাগিল। খানিক পথ মৌনভাবেই কাটিয়া গেল। যুবক সিগারেট টানিতে টানিতে টাইমটেবিল দেখিতেছিল। আর ডিটেক্‌টিভ গম্ভীর মুখে নীরবে বসিয়া তাহারই ভাবভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন এবং ভাবিতে-ছিলেন যুবকটীর সহিত এখন কেমন করিয়া আলাপ আরম্ভ করা যায়!

লোকটার আকৃতি প্রকৃতি ও নিস্পরোয়া ভাব দেখিয়া ডিটেক্‌টিভের মনে সন্দেহ হইতেছিল, তাঁহার এ ধারণা হয় তো ভ্রান্ত, এ ভদ্রসন্তান বাস্তবিক নিরপরাধী। কিন্তু তাহার পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। সেজন্য উৎসুক চিত্তে আলাপের অবসর খুঁজিতেছিলেন। যুবক খানিক পরে যখন নিঃশেষিত সিগারেটটীতে শেষ টান দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া টাইমটেবিলটি বেঞ্চের উপর রাখিয়া দিল, তখন একটা সূত্র পাইয়া মিঃ বোস বিনয় প্রকাশ করিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, "আপনার টাইমটেবিলখানা একবার দেখতে পারি কি ?"

যুবক তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া টাইমটেবিলখানি তাঁহার দিকে ফেলিয়া দিয়া সহাস্যবদনে পরিষ্কার বাঙ্গালায় বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে! আপনি বুঝি কাছাকাছি কোথাও নাম্‌বেন ?"

"না মশাই! আমার এ যাত্রা এখন শীঘ্র শেষ হবার সম্ভাবনা নেই।"

"তাই নাকি ? কোথায় যাচ্ছেন ?"

"হরিদ্বার।"

যুবকের হাস্যোৎফুল্ল মুখে যেন ঈষৎ ভাবান্তর দেখা গেল, কিন্তু সে নিমেষের জন্য। অচিরেই সে ভাবান্তর গোপন করিয়া লইয়া যুবক বেশ সহজ স্বরে যেন বাস্তবিক প্রীত হইয়াই বলিল, "যাক্ ভালই হ'ল, তবু একজন স্বদেশী সঙ্গী পাওয়া গেল। এতখানি দূরপথ এই সব বিদেশী লোকদের সঙ্গে কেমন করে কাটাবো, সেই একটা ভাবনা হয়েছিল।"

"আপনিও কি হরিদ্বারের যাত্রী নাকি ?"

"আজ্ঞে হঁ্যা ।"

"ভালো ভালো, বড় সুখী হলুম একথা শুনে, আপনাদের মত শিক্ষিত নব্য যুবকেরা এসব মহৎ কাজে অগ্রণী না হ'লে কি হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা হয় ? আপনার উদ্দেশ্য ?"

যুবক বাধা দিয়া ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত বলিল, "আপনি আমাকে ভুল বুঝ্ছেন মশাই, আমার এ তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য শুধু পুণ্যার্জ্জন নয় ।

"অর্থাৎ ?"

"ওদেশটা একবার দেখবার জন্যে আমার বহুদিন থেকেই আগ্রহ ছিল কিন্তু এপর্য্যন্ত সুবিধা হয়ে উঠেনি, তাই এই মেলার হিড়িকে বেরিয়ে পড়লুম ।"

"বেশ তোঃ তাহলে আপনার এক কাজেই দুই কাজ, অর্থাৎ রথ দেখা কলা বেচা দুই হবে । কি বলেন ?" বলিতে বলিতে মিঃ বোস হাসিয়া উঠিলেন ।

যুবকও সে হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, "যা বলেছেন !" তারপর মিঃ বোসের সঙ্গে আনীত ব্যাগটার দিকে একবার বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "মাপ করবেন, অতখানি দূরপথের যাত্রী আপনি, অথচ সঙ্গে বিছানা পত্র কিছুই দেখছি না, তাতে অসুবিধা হবে না আপনার ?"

মিঃ বোস তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধিবলে তৎক্ষণাৎ একটা সদুত্তর যোগাইয়া বলিলেন, "তা অসুবিধে একটু হবে বই কি ; কিন্তু হরিদ্বারে একবার যেমন তেমন করে পৌঁছুতে পারলে ব্যস্, আর কোনও চিন্তা নেই । সেখানে আমার একজন আত্মীয় আছেন কি না, সেই ভরসায় ওসব লটবহর না নিয়েই হঠাৎ 'দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়েছি । ভেবে চিন্তে কোনও কাজ করা আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি মশাই । সেজন্যে সময় সময় বিলক্ষণ অসুবিধায় পড়তে হয় ।"

"তাইতো ? আজকের রাত তো নয়, তবে কালকের রাত আপনার কাটানো কষ্টকর হয়ে পড়বে, পশ্চিমে যে হাড় কাঁপান শীতের বর্ণনা শুনেছি।"

"সে দেখা যাবে এখন ?"

ক্ষণকাল দুইজনেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সেই নিস্তব্ধতা কাটাইয়া মিঃ বোস জিজ্ঞাসা করিলেন, "পশ্চিম অঞ্চলে আপনি এর আগে একবারও যান নি বুঝি ;" "গিয়েছি, কাশী পর্যান্ত, কিন্তু তার আগে নয়। বাংলা দেশের বাবুদের পক্ষে পশ্চিম যাত্রাটা কি রকম দুরূহ ব্যাপার তা জানেন তো ; যদিও আমার পক্ষে বেড়াবার সুযোগ সুবিধে যথেষ্টই, তবু কল্‌কেতার আয়েস আরাম ছেড়ে সেই মেড়ুয়াবাদীদের দেশে সাধ করে ধূলো খেতে কে যায় বলুন ; এতো একটা খেয়ালের ঝোঁকে বেরিয়ে পড়েছি, সেখানে গিয়ে তিষ্ঠোতে পারব কি না বলতে পারি না, আবার ফেরৎ গাড়ীতেই না ফিরে আসতে হয় !" বলিয়া মিঃ বোসের মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণ বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া যুবক আপন মনেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এই প্রিয়দর্শন মিষ্টালাপী যুবকের সরলতা ও স্পষ্টবাদিতায় আমোদিত হইয়া মিঃ বোস সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি বুঝি কল্‌কেতার ঘোর ভক্ত ?"

"নিশ্চয়ই ! অমন আরাম আয়েসের জায়গা আর কোথায় আছে বলুন দেখি ? কিন্তু আমাদের বাংলার পল্লীগ্রামও নেহাত মন্দ লাগে না আমার, তবে দু'চার দিনের বেশী নয়, বাবার সঙ্গে যখনই আনন্দপুরে যাই,—"

"আনন্দপুরে কি আপনাদের—"

"আমাদের আদি বাসস্থান, কিন্তু সেখানে বাস করাটা বড় একটা

ঘটে উঠে না। দোল দুর্গোৎসব উপলক্ষে কখনো সখনো দু'চার দিনের জন্য গিয়ে থাকা হয়, এই পর্য্যন্ত।"

মিঃ বোস এই অপরিচিত যুবকের পরিচয় যতই পাইতেছিলেন, ততই তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। তবে কি তিনি শুধু একটা ভ্রান্ত সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মূল্যবান সময়ের অপব্যয় এবং একবস্ত্রে এত দূরপথ যাত্রার ক্লেশ বৃথাই স্বীকার করিলেন নাকি? কিয়ৎক্ষণ আপন মনেই নীরবে চিন্তা করিয়া মিঃ বোস প্রশ্ন করিলেন, "কল্‌কেতায় আপনার কি করা হয়?"

"আপাততঃ কিছুই না। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে এম-এ পড়ছিলুম, কিন্তু শরীর কিছু খারাপ বোধ হওয়ায় ছুটী নিয়েছি।"

কিন্তু যুবকের স্বাস্থ্যপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহখানির কুত্রাপি অস্বাস্থ্যের লক্ষণ ছিল না। সবিশেষ জানিবার আগ্রহে মিঃ বোস পুনশ্চ বলিলেন, "আপনার পিতার পরিচয়—"

"এটর্ণী কে, পি, চৌধুরীকে আপনি জানেন কি?"

"তা আর জানি না? তিনি যে কলকেতার মধ্যে একজন বিখ্যাত লোক।"

"হ্যাঁ, তিনিই আমার পিতা।"

মিঃ বোস যুবকের এই কথায় অজ্ঞাতে একটু চমকিয়া উঠিলেন। এটর্ণী কে, পি, চৌধুরীর সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ আলাপ পরিচয় না ঘটিলেও তাঁহাকে যে তিনি ভাল মতেই জানেন। সেই মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তান, এত বড় বনিয়াদী উচ্চ বংশের বংশধর এই যুবক, তাহাতে আবার 'কৃতবিদ্য। ইহার দ্বারায় কি এমন একটা গর্হিত কাজ হওয়া সম্ভব? আর ধনবান্ পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া সে এই জঘন্য জাল সৃজি করিতে যাইবে কোন্ দুঃখে? কিছু

লজ্জিত ও অনুতাপিত হইয়া মিঃ বোস নিজের দুর্ব্বুদ্ধিকে ধিক্কার প্রদান করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন একজন নির্দ্দোষী ভদ্র সন্তানকে অনর্থক সন্দেহ করিয়া তিনি বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়া মরিতেছেন, ওদিকে প্রকৃত যে অপরাধী সে হয়'ত এতক্ষণ হাওড়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া ডিটেক্‌টিভের এই আহম্মকী ও অজ্ঞতায় হাসিয়া আকুল হইতেছে এবং আরও শিকারের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। হায়! হায়! আজ কি ভুলই করিয়া ফেলিয়াছেন তিনি! মিঃ বোসের একবার ইচ্ছা হইল পরবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিয়া পড়িয়া আবার যেখান হইতে আসিয়াছেন সেই-খানে ফিরিয়া যান, কিন্তু যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তখন শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড়াটা কি উচিত হইবে? যদি ঐ লোকটা ভদ্রতার ছদ্ম আবরণে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া থাকে, তাহাও তো অসম্ভব নহে। মিঃ বোস যখন মনে এই সকল কথা পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন, তখন যুবকটী আড়ে আড়ে তাঁহারই দিকে চাহিয়াছিল, যেন তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়া সে তাঁহার মনের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে দ্রুতগামী এক্‌স্‌প্রেস্‌খানি দুই তিনটী ষ্টেশন ছাড়াইয়া গেল। বেলাও শেষ হইয়া আসিল। রক্তাম্বরা চঞ্চলা বালিকা গোধূলির প্রাণখোলা আনন্দ হাসির মধুর লালিমাটুকু শ্যামা-ঞ্চলের তলে নিঃশেষে গোপন করিয়া দিয়া তখন শ্যামাসুন্দরী সন্ধ্যারাণী ধরণীবক্ষে স্বীয় পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শীতল সান্ধ্য সমীরণ মুমূর্ষুর দীর্ঘশ্বাসের মত ঘন ঘন বহিতে আরম্ভ করিল। সেই বাতাসে চলন্ত গাড়ীর মধ্যে বেশ একটু শৈত্য অনুভব হইতেছিল। নিজের দিকের খোলা জানালার সার্সীটা তুলিয়া দিয়া যুবক অন্যমনা মিঃ বোসকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখছেন, ? এরি মধ্যে কেমন ঠাণ্ডা

বোধ হচ্ছে ? আচ্ছা, আপনি ওরকম আড়ষ্ট হয়ে কতক্ষণ বসে থাকবেন মশাই ? বেশ ভালো হয়ে আরাম করে বসুন না ! এ যাত্রার তো ছত্রিশ ঘণ্টার আগে শেষ হবার সম্ভাবনা নেই !"

মিঃ বোস মনের চাঞ্চল্য দমন করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "যা বলেছেন ! পথখানি তো বড় অল্প নয় ! তাই ভাবছি ঝোঁকের মাথায় ফস্ করে বেরিয়ে পড়ে ভালো কাজ করিনি, দু দুটো গোটা রাত ট্রেণে কাটানো কি সহজ ব্যাপার ?"

মিঃ বোসের মুখের দিকে একটা বক্র কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া যুবক হাসিমুখে বলিল, "গতস্য শোচনা নাস্তি। আপনার এ যাত্রা তো নিষ্ফল হবে না মশাই ? কুম্ভস্নানের অক্ষয় পুণ্যলাভ কজন লোকের ভাগ্যে ঘটে ?" এই নিষ্ফল কথাটা সে একটু জোর দিয়াই বলিল।

মিঃ বোস আপনার মনেই ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "নিষ্ফল বইকি ? এ যাত্রা যে শেষে নিছক তীর্থযাত্রাই হয়ে দাঁড়াল !"

তিনি ভালো হইয়া বসিলে যুবক পকেট হইতে একটা পালিশ করা চক্‌চকে সোণার সিগারকেস বাহির করিয়া মিঃ বোসের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "একটা নিন না।"

মিঃ বোসের চক্ষে সহজেই পড়িল, সেই কেসের উপরকার খোদাই করা ইংরাজী অক্ষর কয়টা 'এ, পি, চৌধুরী।' লোকটার পরিচয় তাহা হইলে বাস্তবিকই জাল নহে আসল ! মিঃ বোসের মনের কোণে যে ক্ষীণ আশাটুকু মিটি মিটি জ্বলিতেছিল, এতক্ষণে তাহা নিঃশেষে নিভিয়া গেল।

আজিকার ব্যর্থ চেষ্টা ও নিষ্ফল যাত্রার কথা ভাবিয়া, তিনি ভগ্নোদ্যম ও ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু লোকটার ধৈর্য্য ছিল অসাধারণ। তিনি যে কাজ আরম্ভ করিতেন, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না।

সে মনের সেই চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ বাহ্যিক প্রকাশ না করিয়া মিঃ বোস বেশ প্রফুল্লভাবেই সিগারকেস্‌টা তাহার অধিকারীকে ফিরাইয়া দিয়া ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন, "আমার ওসব অভ্যাস নেই।"

"সত্যি নাকি? তাহলে আপনিই ভাল আছেন মশাই! মানুষের কোনও নেশারই বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কিন্তু কজন তা পারে বলুন? আচ্ছা, তাহলে এতবড় শীতের রাতটা আপনি কি করে' কাটাবেন? ঘুমিয়ে? তবে উঠুন, আপনার বিছানার বন্দোবস্ত আমি করে দিই।"

যুবকের সৌজন্যে প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া মিঃ বোস শশব্যস্তে বলিলেন, "না না, কিছু দরকার নেই এইতো দিব্যি পুরু গদী আঁটা রয়েছে।"

"তা হোক, শীতের সময় শুধু চামড়ার গদী ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করে গায়ে লাগবে যে।" বলিতে বলিতে নিজের বেডিং উপর হইতে নামাইয়া যুবক তাহা হইতে একখানি দামী র‍্যাগ ও মল্লিকাফুলের মত সাদা ধবধবে 'ফ্রিল' দেওয়া বাহারে উপাধান বাহির করিয়া বলিল, "উঠুন।"

সেই ধনিনন্দনের অসাধারণ বদান্যতা ও সদয় ব্যবহার মিঃ বোস্‌কে বাস্তবিক মুগ্ধ করিয়া তুলিল। এই সদাশয় অমায়িক ভদ্র যুবককে তিনি কি না জালিয়াৎ বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন! মনে মনে অনুতপ্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যুবকের শয্যারচনায় উদ্যত হাত দুখানা তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিয়া সসঙ্কোচে বলিয়া উঠিলেন, "আহা! করেন কি? আপনি আমাকে এমন করে লজ্জিত করছেন কেন মশাই? তার চেয়ে দিন বিছানাটা আমি আপনার জন্যে পেতে দিই, আপনাকেও ত সারা রাত কাটাতে হবে?"

"আমার বিছানা আরো আছে, তার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না। আচ্ছা, তবে নিন, র‍্যাগ খানা বেশ বড় আছে, এর আধখানা পাতুন, আর আধখানা গায়ে দিন, তাহলে তবু অনেকটা আরাম পাবেন। আর এই নিন্ বালিশ।"

যুবকের সেই সাগ্রহ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মিঃ বোস অগত্যা তাহাই করিলেন। কিন্তু শয়ন করিলেন না, প্রসারিত উষ্ণ শয্যায় বালিশে ঠেসদিয়া আরামে উপবেশন করিয়া তিনি হাস্যরঞ্জিত স্মিতমুখে কহিলেন, "নাঃ! আপনার কল্যাণে দেখছি রাতটা নেহাত মন্দ কাটবে না! কিন্তু আপনি কি দাঁড়িয়েই রাত কাটাবেন না কি?"

"তা কেন? এই যে আমার রাতকাটাবার ব্যবস্থাও করে নিচ্ছি দেখুন না?" যুবক একটা ভেলভেটের হাল্কা সৌখীন গদী বাহির করিয়া নিজ স্থানে বিছাইল, এবং বেডিং জড়ানো কম্বলটা গায়ে দিবার জন্য রাখিল। তাহার পর সুটকেস হইতে একটা চাকচিক্যময় সচিত্র ইংরাজী উপন্যাস বাহির করিয়া মিঃ বোসের দিকে উৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া বলিল, "আমার আবার একটা বড় বদ্ অভ্যাস আছে মশাই! ট্রেণে মোটেই ঘুম আসে না।"

বইখানির পানে চাহিয়া মিঃ বোস সহাস্যে কহিলেন, "ও! তাই বুঝি রাত জাগবার ওষুধ সঙ্গে এনেছেন?"

এইরূপে দুইজনের আলাপ পরিচয় ক্রমেই জমিয়া উঠিল। যুবকের মিষ্ট আলাপ ও শিষ্ট আচরণে মিঃ বোস যেন ভুলিয়া যাইতেছিলেন যে, কি উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এ লোকটার পাছু লইয়াছেন। একটা বড় ষ্টেশনে নামিয়া গিয়া যুবক রিফ্রেশমেণ্টরুমে নৈশ ভোজন সমাধা করিয়া আসিলেন। মিঃ বোস নামিলেন না গাড়ীতেই কিছু জলখাবার কিনিয়া এ বেলার মত আহার সারিয়া লইলেন।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। আলোর উপর 'শেড্'টা টানিয়া দিয়া অপর প্রান্তের বেঞ্চের উপর ইংরাজদম্পতী নিদ্রা বা বিশ্রামের আশায় একটুখানি আড় হইয়া পড়িলেন! ছেলেমেয়েগুলি অনেক আগেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

মিঃ বোসও আর বসিয়া পাহারা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধে যুবক-দত্ত শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু যুবক শয়ন করিল না! সে নিজের দিককার আলোর 'শেড্' ঈষৎ মাত্র ফাঁক করিয়া কামরার ভিত্তিতে পিঠ রাখিয়া, অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় নভেল পাঠে মনোনিবেশ করিল। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। রজনীর নিস্তব্ধতা আরও গভীর হইয়া উঠিল। কেবল জনশূন্য প্রান্তর পথে দ্রুত ধাবমান ট্রেণখানির সুগম্ভীর গম্‌গম্ হুস্‌হুস্ শব্দ যেন সেই নৈশ নীরবতার স্তব্ধ বুকখানা বিদীর্ণ করিয়া দিয়া একটা আর্ত্ত হাহাকার জাগাইয়া তুলিতেছিল।

মিঃ বোসের শ্রান্ত চক্ষে মাঝে মাঝে তন্দ্রার আমেজ আসিলেও তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রার অঙ্কে আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেছিলেন না। চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধ মুদ্রিত, কখনও বা মুদ্রিত করিয়া তিনি তখন আত্মগত ভাবে কত চিন্তা, কত প্রশ্নই করিতেছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। কখন ভাবিতেছিলেন যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে, এক্ষণে এ অলীক মরীচিকার পশ্চাতে বৃথা ধাবমান না হইয়া এলাহাবাদ ষ্টেশনে নামিয়া পড়িয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাইবেন আবার পরক্ষণেই ভাবিতেছেন, নাঃ! যুবককে শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িয়া দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। দীনদয়ালের বর্ণনার সহিত এ লোকটার সাদৃশ্য তো বাস্তবিক মিলিয়াছে। ভাবনার মধ্যে থমকিয়া এক একবার মুদিত চক্ষু ঈষৎ মাত্র উন্মীলিত করিয়া মিঃ বোস বেঞ্চের অন্যপ্রান্তে উপবিষ্ট বিনিদ্র যুবকের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহার বোধ হইল যুবকের

সেই পূর্ব্বের সরস প্রফুল্লতা ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত ভাব এখন যেন আর নাই। 'শেডে' ঢাকা ল্যাম্পের অনুজ্জ্বল আলোকে তাহার সুন্দর মুখখানি বড় উদাস ও চিন্তাকুল দেখাইতেছে। বইখানা হাতে ধরিয়া থাকিলেও পড়ার দিকে তাহার মন বা দৃষ্টি কিছুই ছিল না। পুস্তক হইতে চক্ষু দুটী তুলিয়া সে প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহারই দিকে চাহিতেছিল। সে চাহনি যেন কেমন রহস্যময়, সে দৃষ্টিতে যেন অন্তরে বিরক্তি ও সন্দিগ্ধভাব মাখান ছিল। একি যথার্থ, না ডিটেক্‌টিভের তন্দ্রা-জড়িত নয়নের ভ্রান্তি মাত্র?

তেরো

এলাহাবাদ ষ্টেশনে নামাও হইল না, পথে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটিল না। দীর্ঘপথ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া মিঃ বোস যথাসময়ে পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে আসিয়া পঁহুছিলেন। ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া যুবক বিনীত নমস্কার সহ মিঃ বোসের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। মিঃ বোসের একবার মনে হইল, গোপনে গোপনে এই যুবকের সঙ্গ লইয়া তাহার এখানকার গন্তব্যস্থল দেখিয়া আসেন, কিন্তু আবশ্যক বোধ করিলেন না। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া'ও তিনি সন্দেহের আভাস মাত্র পান নাই, বরং সেই সরল স্বভাব যুবকের অমায়িক ভদ্র আচরণ তাঁহাকে সমধিক প্রীতই করিয়াছিল। এখন সেই নির্দ্দোষ ভদ্রলোকটীর পশ্চাতে গোয়েন্দাগিরি করিয়া তাঁহার মহত্ত্বের অবমাননা করিতে মিঃ বোসের মন সরিল না।

যুবককে ভদ্রতার সহিত বিদায় দিয়া মিঃ বোস একখানা টাঙ্গা ভাড়া করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্থানীয় দেবালয় ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি যতদূর সম্ভব দেখিয়া বেড়াইলেন। দ্বিতীয় বস্ত্রাভাবে গঙ্গাস্নান ঘটিয়া উঠিল না। এক গণ্ডূষ গঙ্গাজল মাথায় দিয়া বৈকালের দিকে ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলেন। পুণ্যযোগের প্রতীক্ষায় হরিদ্বারে বসিয়া থাকিলে ত চলিবে না, ফেরৎ ট্রেণেই তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া যত শীঘ্র সম্ভব এই জাল নোটের মামলার তদন্ত করিতে হইবে। কিন্তু কলিকাতার গাড়ী আসিতে তখনও অনেক দেরী। একখানি গাড়ী প্লাটফর্ম্ম ছাড়াইয়া অনেক দূরে দাঁড়াইয়াছিল।

মিঃ বোস একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, এ গাড়ী খানি খানিক বাদে সোজা দেরাদুন যাইবে। এগাড়ী এখান হইতেই প্রস্তুত হইয়া যায়, সেজন্য প্লাটফর্ম্মের বাহিরে থাকিলেও অনেক যাত্রী ভাল জায়গা পাইবার জন্য লাইন ডিঙ্গাইয়া গিয়া ইহারই মধ্যে গাড়ীতে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দুই আড়াই ঘণ্টার পূর্ব্বে কলিকাতার ট্রেণ ধরিবার সম্ভাবনা নাই, এই সময়টা একটু বিশ্রাম লইবার অভিপ্রায়ে মিঃ বোস ষ্টেশনে ওয়েটিং রুমের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে প্লাটফর্ম্মে কিসের একটা কোলাহল শুনিতে পাইয়া তিনি গতি ফিরাইয়া সেইদিকে চলিলেন। গিয়া দেখিতে পাইলেন একস্থানে কতকগুলি লোক একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে ঘেরিয়া গোলমাল করিতেছে। স্ত্রীলোকটী বাঙ্গালী ও বিধবা। সে মাথায় হাত দিয়া পা ছড়াইয়া মাটীর উপর বসিয়া কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ দুর্ভাগ্য ও পোড়া বিধাতার নিন্দা করিতেছিল তাহার কাছেই একটী এগার বছরের শীর্ণ বালক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া সমাগত জনমণ্ডলীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া ছিল, এবং মধ্যে মধ্যে "তুমি কেঁদনা ঠাকুমা! আমি এখনি পিসেমশাইকে তার করে দিচ্ছি, থামো ঠাকুমা!" বলিয়া রোরুদ্যমানা পিতামহীকে সান্ত্বনা দানের বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল।

ঘটনাস্থলে একজন পুলিশ কনেষ্টবলও উপস্থিত ছিল। মিঃ বোস তাহাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে সে একখানি নোট তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখুন দেখি মশাই! এ নোট খানা কি সত্যি সত্যি জাল নয়?" নোটখানা দেখিয়াই মিঃ বোস চমকিয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি হাতে লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন এযে ঠিক

সেইরূপ পাঁচ টাকার জাল নোট—যেরূপ হাওড়া বুকিং অফিস হইতে ইতিপূর্ব্বে আরও দুইখানি পাওয়া গিয়াছিল! তবে কি এই জালনোটের পরিচালক এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছে ?

চকিতের মত মিঃ বোসের মনে পড়িল তাঁহার দীর্ঘপথের সঙ্গী সেই সম্ভ্রান্ত ভদ্র যুবকের কথা। হায়,! হায়,! যাহার সন্ধানে এত কষ্ট স্বীকার কবিয়া এতদূরে ছুটিয়া আসিলেন, তাহাকে হাতে পাইয়াও এত শীঘ্র কেন ছাড়িয়া দিলেন ? এখানেও তাহার গতিবিধির উপর গোপনে দৃষ্টি রাখিলেন না কেন ?. এই জাল নোটের ব্যাপারে সে লোকটা জড়িত আছে নিশ্চয়। নিজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতপ্ত হইয়া মিঃ বোস কনেষ্টবলকে কহিলেন, "হ্যাঁ, এ নোট জালই তো, তুমি এখানা কোথায় কার কাছে পেয়েছ ?"

কনেষ্টবল অদূরে উপবিষ্ট এক মিষ্টান্ন বিক্রেতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ লোকটার কাছে। কিন্তু আসলে এ নোটখানা ও পেয়েছে এই বুঢ়ী মাইয়ের কাছে। বুঢ়ীমায়ী মিঠাইওয়ালার কাছ থেকে পাঁচসিকের একসের পেঁড়া কেনে। কিন্তু ওর কাছে ভাঙ্গানো টাকা না থাকায় মিঠাইওয়ালাকে এই নোটখানা দিয়ে পেঁড়ার দাম বাদে বাকি টাকা পয়সা সে ফেরত নিয়েছিল। কিন্তু নোটখানা হাতে নিয়ে তার চেহারা দেখে মিঠাইওয়ালার মনে কেমন সন্দেহ হয়, তাই সে তখনই ষ্টেশনের দু'চার জন ভদ্রলোককে দেখালে, দেখে সবাই যখন বল্লেন এ নোট আসল নয় জান, তখন ও আবার ফিরে এসে বুড়ীমায়ীকে ধরেছে।"

মিঃ বোস কনেষ্টবলের দিকে অবনত হইয়া তাহার কাণে কাণে অন্যের অশ্রাব্য স্বরে চুপি চুপি কি বলিলেন। অমনি সে সসম্ভ্রমে মাথা ঝুঁকাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তাহার পর বৃদ্ধাকে সম্বোধন

করিয়া সে বলিল, "এ বুঢ়ী মায়ী! এই বাবু সাহেবের কাছে তোমার সব হাল খুলে বলো, ইনিই তোমার কিনারা করতে পারবেন।"

বৃদ্ধা এতক্ষণে যেন অকূলে কূল পাইয়া মিঃ বোসের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি বুঝি বাঙ্গালী লোক বাবা! আঃ বাঁচলুম! পোড়া মেড়োর দল, কেউ কথাও বোঝে না কিছু না, সেই নাগাৎ একেবারে জ্বালাতন করে মেরেছে, তুমি আমাকে উদ্ধার করো বাবা! আমাকে বাঁচাও! বিদেশে বিভূঁইয়ে এসে আমি বড়ই বিপদে পড়ে গেছি" বলিতে বলিতে সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মিঃ বোস তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া মিষ্টবাক্যে কহিলেন, "তোমার কোনও ভয় নেই বাছা! আমাকে তোমার সব কথা বলো দেখি, যদি কিছু করতে পারি। আগে বলো, এ নোটখানা তুমি পেলে কোথায়?"

বৃদ্ধা কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "এই তোমাদেরি টিকিট ঘর থেকে। আমি মেয়ে মানুষ, তায় বুড়ো মানুষ, এসব জালসাজির কি বুঝি বলো? সেইজন্যেই তো গণুর বাপকে সঙ্গে করে টিকিট কিনতে এসেছিলুম, তা সে মিন্সেও কি চক্ষের মাথা খেয়েছে, নোটখানা আসল কি জাল তা দেখে নিতে পারল না! দোহাই বাবা, দোহাই ধর্ম্মের—এই তীর্থস্থানে গঙ্গার দিকে মুখ রেখে ইষ্টদেবতার দিব্যি করে বল্‌ছি,—আমি নির্দ্দোষী, নিরপরাধী, এসব রেলকোম্পানীর কারসাজি।"

মিঃ বোস জিজ্ঞাসা করিলেন, "গণুর বাপ কে? তিনি কি তোমার কেউ—"

"না বাবা! আমার কেউ নেই, কেউ থাক্‌লে কি পোড়া কপালীর কপালে এসব এ খোয়ার ঘটে, একটী ছেলে, হাতীর মতন জোয়ান তাকেও সেদিন যমের মুখে ধরে দিয়েছি। তারই নিদর্শন এইগুঁড়ো-

টুকু, তা ও ছেলেমানুষ এসব চালাকি কি বোঝে বলো? কিন্তু গণুর বাপ—"

"তিনি এখন আছেন কোথায়?"

"সে টিকিট কিনে দিয়ে নিজের আড্ডায় ফিরে গেছে। পাড়া-প্রতিবাসী এতটাই যে করেছে এই ঢের। তখন কি জানি এই বিভ্রাট ঘটবে, তাহলে গাড়ীতে না উঠে তাকে ছাড়তুম না।"

তুমি হরিদ্বারে কুম্ভস্নানেই এসেছিলে না?"

"হ্যাঁ বাবা! ভাবলাম সমস্ত পিরথীমির লোক যাচ্ছে, আমিও যাই, ইহকাল তো গেছে, পরকালের জন্যে কিছু একটু ধম্ম কম্ম করি। সঙ্গী ও জুটে গেল। গণুরা সবাই এলো, তার সঙ্গে নাতিটাকে নিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। তখন কি জানি অভাগীর কপালে এত ভোগান্তিক আছে।"

"তাহলে এখন তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে? কই তোমার টিকিট?"

বৃদ্ধা তাহার পেট কোঁচড় হইতে দুইখানি টিকিট বাহির করিল, মিঃ বোস দেখিলেন দেরাদুন থার্ডক্লাসের টিকিট। তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু এসময় দেরাদুন যাচ্ছ কেন, স্নান তো এখনো হয় নি।"

"দেরাদুনে যে আমার মেয়ে জামাই রয়েছে বাবা! ঐ একটী মাত্তর মেয়ে, মেয়েটী ভরা পোয়াতী আসতে পারলে না, তাই ভাবলুম স্নানের তো এখন দুদিন দেরি আছে, এতদূর থেকে এসেছি তখন এরি মধ্যে মেয়েটাকে একবার দেখে যাই, আর জামাইয়ের ঠেঁয়ে কিছু খরচ পত্তর ও চেয়ে আনি, আমার দেবার লোক সংসারে আর কে আছে বাবা; তা জামাইটী আমার বড় ভালো আহা! বাছা আমার বেঁচে থাক, একশো বচ্ছর পরমায়ু পাক্—"

"গণুর বাবা বুঝি তোমাদের টিকিট কিনে দিয়েই চলে গেলেন; এ পাঁচটাকার নোট খানা তিনি—"

"ঐ টিকিট ঘর থেকেই পেয়েছিল, আমার কাছে দশ টাকার যে নোট ছিল, সে খানা টিকিট বাবুকে দিয়ে সে এই টিকিট দুখানি, এই পাঁচ টাকার নোট আর গণ্ডা কতক পয়সা আমার হাতে দিয়ে যায়, গাড়ীর তখনও দেরি ছিল তাই আর অপেক্ষা করতে পারলে না। সঙ্গে মেলাই ছেলে পিলে ঝি বউ আছে তো? মেলার ভিড়ে তাদের একলা রাখে কেমন করে? তা যাক্ গে, মনে করলুম এদ্দিন পরে মেয়ে জামাইকে দেখ্‌তে যাচ্ছি, শুধু হাতে যাব; তাই ওই মেঠাইওয়ালার কাছ থেকে এক সের মিষ্টি কিনে নিলুম, তার পর—" এঞ্জিনের তীব্র হুইসেলের শব্দে বৃদ্ধার কথার শেষার্দ্ধ শুনিতে পাওয়া গেল না।

ট্রেণ ছাড়িবার তখনও দেরি আছে। কয়েক খানা গাড়ী সঙ্গে লইয়া এঞ্জিন হুস্ হুস্ করিয়া 'সাণ্ট্' করিয়া বেড়াইতেছিল। চলন্ত গাড়ী গুলির মধ্যে একখানা সেকেণ্ড্, একখানা ইণ্টার, আর একখান থার্ড ক্লাস ও ছিল। গাড়ীখানা যেদিকে আসিতেই সেই থার্ড ক্লাসের কামরায় একখানি পরিচিত মুখ দেখিতে পাইয়া মিঃ বোস চকিত হইয়া উঠিলেন, তিনি আরও কাছে গিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন হাঁ এযে সেই লোক; সেই এ, পি, চৌধুরী নামধারী ভদ্র যুবক। শুধু পোষাকের পরিবর্ত্তন করিয়াছে, খাকি রংয়ের মিলিটারী ধরণের সুট পরিয়া সে এবার নুতন মানুষ সাজিয়া বসিয়াছে। তথাপি মিঃ বোসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে এড়াইতে পারিল না।

মিঃ বোসের সন্দেহ এবার দৃঢ় প্রতীতিতে পরিণত হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন এই ভদ্র যুবকই এই জাল যাজি ঘটনার প্রধান নায়ক। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার অধিকার ত

তিনি পাইতেছেন না। সে জন্য চুপি চুপি ফিরিয়া আসিলেন এবং কনেষ্ট-বলকে সেই জাল নোট ও বৃদ্ধা সম্বন্ধে এখন কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিয়া যে গাড়ীগুলি 'সাণ্ট' করিবার সময় এঞ্জিন কাটিয়া পিছনে ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহার সর্ব্বশেষে ব্রেকভ্যানের সঙ্গের একখানা কামরায় তিনি নিঃশব্দে উঠিয়া পড়িলেন। যুবকের অজ্ঞাতে তাহার অনুসরণ করিয়া যদি তাহার বিরুদ্ধে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন, সেই আশায় ডিটেক্টিভের এই অনির্দ্দেশ যাত্রা।

অল্পক্ষণেই 'স্যাণ্ট' শেষ করিয়া এঞ্জিন পরিত্যক্ত গাড়ীগুলি লইয়া প্লাটফরমের মাঝামাঝি আসিয়া দাঁড়াইল। মিঃ বোস তখন অন্যমনা হইয়া প্লাটফর্ম্মের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া যাত্রীদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

গাড়ীখানা এইখান হইতেই রওয়ানা হয়, সুতরাং যাত্রী শুধু উঠিতেছিল, নামিতেছিল না। দুই চারিজন আরোহী জল বা আহার্য্যের সন্ধানে ক্ষণেকের জন্য নামিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সেই মিলিটারী বেশধারী যুবককে দেখা গেল না। তথাপি চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনার্থে মিঃ বোস একবার নামিয়া গিয়া ধীরে ধীরে সতর্কতার সহিত দেখিয়া আসিলেন, নাঃ সে নামে নাই, যেখানে ছিল সেই খানেই বসিয়া কি একখানি বই দেখিতেছে, সম্ভবতঃ টাইম টেবিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্রেণ ছাড়িল। চলন্ত গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া মিঃ বোস পরিত্যক্ত প্লাটফর্ম্মের দিকে প্রখর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু সেখানে দুই চারিজন ফেরিওয়ালা, পানিপাঁড়ে এবং কয়েকজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী ভিন্ন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। এই ধূর্ত্ত যুবকটীর গন্তব্য স্থল যে কোথায়, তাহা মিঃ বোস এখনও

জানিতে পারেন নাই, তবে তাহার এ রেলওয়ে পথে যাত্রার সীমানা যে দেরাদুন পর্য্যন্ত সেইটুকু তিনি জ্ঞাত ছিলেন। যদি মাঝখানে সে আর কোনও ষ্টেশনে নামিয়া পড়ে, সেই আশঙ্কায় অতঃপর ছোট বড় সকল ষ্টেশনেই মিঃ বোস যুবকটীর প্রতি গোপনে সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন। কিন্তু কোন খানেই তাহাকে নামিতে দেখা গেল না। তিনি এবার স্থির জানিলেন এক্ষণে দেরাদুনই যুবকের গন্তব্যস্থল।

চৌদ্দ

সাবধানতার অনুরোধে গাড়ীখানা দেরাডুন ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া থামিতে না থামিতে মিঃ বোস বালকের মত ক্ষিপ্র গতিতে লাফাইয়া পড়িলেন। যাহাতে সেই ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া সরিয়া পড়িতে না পারে, সেই আশঙ্কায় তিনি তাড়াতাড়ি সেই থার্ড ক্লাস কামরার কাছে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু কই, যুবক ত সেথায় নাই! মিঃ বোস এই অভাবিত ঘটনায় ক্ষণেকের জন্য বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই ত আগের ষ্টেশনেও তিনি যুবককে যথাস্থানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছেন, ইহার মধ্যে সে কোথায় অন্তর্হিত হইল, কোন্ পথে পলায়ন করিল? ডিটেক্‌টিভের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য সে চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িল নাকি? তাহার মত শিক্ষিত ধূর্ত্তের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।

দেরাডুন ষ্টেশনে ট্রেণ ছাড়িবার তাড়া না থাকিলে ও যাত্রীদের মধ্যে নামিবার জন্য বিলক্ষণ তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাদিগকে মিঃ বোস পলায়িত যুবকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনও সঠিক সংবাদ পাইলেন না। কেহ বলিল ষ্টেশনে গাড়ী আসিবার খানিক আগে সে লোকটা ওধারের দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, কেহ বা হাঙ্গামায় পড়িবার ভয়ে যুবকটীর অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়া বসিল। মিঃ বোস তখন সে কামরা ছাড়িয়া পরবর্ত্তী কামরা দেখিলেন, সেকেণ্ড ক্লাস, ফার্ষ্ট ক্লাস সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু পলায়িত যুবকের কোথাও কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না। মিঃ বোস অগত্যা ষ্টেশন ছাড়িয়া দেরাডুনের প্রধান প্রধান হোটেলগুলিতে সন্ধান করিতে

লাগিলেন। একটা হোটেলের ম্যানেজারের নিকট সংবাদ পাইলেন যে, ঐরূপ মিলিটারী পোষাক পরা একজন ভদ্রলোক ঐ হোটেলে প্রাত-রাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পানভোজনের পরক্ষণেই হোটেলের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন, এক মিনিটও বিশ্রাম করেন নাই। ব্যর্থমনোরথ হইয়া মিঃ বোস পুনশ্চ রেলষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলেন। তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। ঘণ্টাখানেক পরেই ট্রেণ ছাড়িবে, সেই গাড়ীতে, তাঁহার চক্ষে ধূলা দিবার অভিপ্রায়ে অপরাধী পুনরায় কলিকাতা কিম্বা হরিদ্বারে ফিরিয়া যাইতেও পারে, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আর কোথাও না গিয়া তিনি ষ্টেশনের মধ্যেই আত্মগোপন করিয়া রহিলেন।

যথাসময়ে ট্রেণ আসিয়া পড়িল। ষ্টেশনখানি সমাগত যাত্রীদের কলকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। অধিকাংশই থার্ডক্লাসের প্যাসেঞ্জার সেজন্য মিঃ বোস একটু অন্তরালে থাকিয়া থার্ডক্লাস-টিকিটপ্রার্থী দিগের গতিবিধির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখিলেন। এত অধিক পরিমাণে যাত্রী সমাগম এ সকল ষ্টেশনে সচরাচর দেখা যায় না, কেবল আসন্ন কুম্ভ মেলার জন্য এমন অসম্ভব ভিড় জমিয়াছে।

একদল স্ত্রীপুরুষ কলরব করিতে করিতে টিকিট কিনিতে যাইতেছিল। তাহারা রাজপুতানার লোক। পুরুষদের মাথার পাগড়ী, হাতের লম্বা বাঁশের লাঠি, নারীগণের সোণা, রূপা, কাঁসা ও গজদন্তনির্ম্মিত অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য ও পরিহিত রঙ্গীন্ ঘাঘরার বিপুল বিস্তার আর অন্যের দুর্ব্বোধ্য বিচিত্র ভাষায় কথোপকথনে স্থানটাকে বৈচিত্র্যপূর্ণ, সঙ্কীর্ণ এবং ধ্বনিমুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই জনতার মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মিঃ বোস একখানা পরিচিত মুখ চকিতে দেখিতে পাইয়া উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলেন। ঐ যে সেই নরনারীর ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন

করিয়া সেই লোকটা টিকিট কামরার ফোকরের নিকট গিয়া দাঁড়াইল ! মিঃ বোস সেই মুহূর্ত্তে সেই ভিড়ের ঠেলা দুইহাতে ঠেলিতে ঠেলিতে আগুয়ান হইয়া একেবারে তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তাঁহার অনুমান অভ্রান্ত, এ সেই চতুর চূড়ামণি এ, পি, চৌধুরীই বটে ! লোকটা টিকিট কিনিতে বিশেষ ব্যস্ত ছিল, সেজন্য মিঃ বোসের আগমন সে লক্ষ্য করিল না। 'ক্যাল্‌কাটা হাওড়া থার্ডক্লাস' বলিয়া সে বুকিং ক্লাকের সম্মুখে গোটাকতক টাকা ও একখানি নোট রাখিতেই মিঃ বোস সচকিত হইয়া দেখিলেন এ নোট যে অবিকল সেইরূপ পাঁচটাকার জালনোট। আর যায় কোথা ! মিঃ বোস তাড়াতাড়ি যুবকের সেই হাতখানাই সবলে চাপিয়া ধরিলেন। এই অতর্কিত আক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তি ভয় পাইল না, শুধু বিস্মিত হইল। হাত ছাড়াইবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া ডিটেক্‌টিভের দিকে মুখ তুলিয়া সে বিস্ময়ভরে বলিয়া উঠিল, "ব্যাপার কি ? আপনি কি চান মশাই ?"

মিঃ বোস দেখিলেন সে মুখে আতঙ্ক বা উদ্বেগের লেশ মাত্র নাই, আছে কেবল বিরক্তি আর বিস্ময়। হাতে হাতে বামাল শুদ্ধ ধরা পড়িয়াও অপরাধীকে এমন নির্ভীক নির্ব্বিকার দেখিয়া মিঃ বোস প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেলেন, কিন্তু অপরাধের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহার হাতে, সুতরাং তাহাকে অবিশ্বাস করিবেন কিরূপে ? যুবক তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া একটু ঝাঁজিয়া উঠিয়া বিরক্তির সহিত বলিল, "আপনি আমাকে ধরছেন কেন ? ছেড়ে দিন।"

মিঃ বোস তাঁহার হাতখানি দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "কি করে ছাড়ি বলুন ? আপনি যে ক্রমাগত জাল নোট চালান করে বেড়াচ্ছেন এর একটা—"

"জাল নোট ? স্বপ্ন দেখছেন নাকি ? কোথায় আছে জাল নোট ?"

মিঃ বোস অন্য হাতে যুবকের প্রদত্ত নোটখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, আপাততঃ এই একখানা দেখুন—তার পর হরিদ্বারে, হাওড়ায় যে সব—"

বাধা দিয়া যুবক তাহার ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে যেন ডিটেক্‌টিভকে ভস্ম করিয়া দিয়া দর্পিত উদ্ধত কণ্ঠে বলিল, "কে বল্লে? আপনি কেমন করে জান্‌লেন এ নোটখানা জাল? পথের মাঝে খামোখা হাঙ্গাম বাধানো, আপনি তো আচ্ছা ভদ্রলোক মশাই!"

গোলমাল দেখিয়া বুকিং ক্লার্ক এবং আরও কয়েকজন রেলকর্ম্মচারী সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। মিঃ বোস তাঁহাদের সম্মুখে নিজের পকেট হইতে হাওড়া ষ্টেশনে প্রাপ্ত জাল নোট দুইখানি এবং একখানি আসল পাঁচটাকার নোট বাহির করিয়া উভয় নোটের পার্থক্য দেখাইয়া দিলেন। সকলেই অবাক্ হইয়া দেখিল এই তিন খানি জাল নোটের সাদৃশ্যে কিছুমাত্র তফাৎ নাই। একই যন্ত্রে, একই ব্যক্তির দ্বারা উহা প্রস্তুত হইয়াছে নিশ্চয়।

যুবক তথাপি হার মানিল না, সে বলিল, "ও নোটগুলোর আমি কিছুই জানি না, তবে এ নোটখানা আমিই দিয়েছি বটে, কিন্তু এতে ধরপাকড় করবার কি কারণ ঘটেছে তাতো বুঝতে পারলুম না! আজ-কাল, শুধু কল্‌কেতা কেন, বড় সহর মাত্রেই যে রকম জাল সাজি চলছে, তা'তে মেকী টাকা পয়সা নোট হাতে আসা তো কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? এইতো আমার কাছে আরও টাকা আরও নোট রয়েছে দেখুন না—এও কি জাল?"

যুবকের দক্ষিণ হাতখানি মিঃ বোস তখনও ধরিয়াছিলেন। সুতরাং সে বাম হাতখানি দিয়া পকেট হইতে আরও একখানি পাঁচ টাকার ও দশ টাকার নোট, আট টাকা নগদ ও কিছু সিকি দুয়ানী বাহির করিয়া দেখাইল। সেগুলি সমস্তই অকৃত্রিম। কিন্তু মিঃ বোস তখনও

তাহাকে ছাড়িবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া ধৃত ব্যক্তি মহা বিরক্ত হইয়া ব্যস্ততার সহিত বলিল, "দেখলেন তো? এখন আমায় ছেড়ে দিন, আর কেন মিছে সময় নষ্ট করছেন? আমাকে এই ট্রেণেই কল্‌কেতায় ফিরে যেতে হবে।" তাহার পর পাঁচটী টাকা বুকিং ক্লার্ককে দিয়া সে শশব্যস্তে বলিল, "দিন, টিকিট দিন শীগ্‌গির! এখানে তামাসা দেখলে তো চলবে না। আচ্ছা বেড়ান বেড়াতে বেরিয়েছিলুম বাবা! কোথাকার পাপ কোথায় এসে দাঁড়াল!"

মিঃ বোসের আদেশে ক্লার্ক তখনই টিকিট আনিয়া দিল। মিঃ বোস নিজের জন্যও একখানি টিকিট আনাইলেন। তাহা দেখিয়া যুবক তাহার ক্রোধারক্ত মুখে একটুখানি শ্লেষের হাসি হাসিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "কি? এবারেও আমার সঙ্গ নিচ্ছেন বুঝি? কিন্তু আমার কাছে এবার আর সে ভদ্র ব্যবহার পাচ্ছেন না! আপনি এমন করে উপকারীর প্রত্যুপকার করেন জান্‌লে কোন্—"

"মাপ করবেন! উপকারীর প্রত্যুপকার করা আমাদের পক্ষে সকল সময় সম্ভব হয় না। আমি আপনাকে এখন কোনও মতেই ছাড়তে পারি না।"

"কেন ছাড়বেন না? একজন ভদ্রলোককে আপনি অনর্থক অপদস্থ করছেন কোন্ দুঃসাহসে? এই কনেষ্টবল! কনেষ্টবল! ইধার আও জলদি, জলদি!" চীৎকার করিতে করিতে যুবক তাহার যৌবনদৃপ্ত বলিষ্ঠ দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া মুষ্টিবদ্ধ হাতখানায় এমন প্রবল এক ঝাঁকুনি দিল যে প্রবীণ বয়স্ক ডিটেক্‌টিভ অসাধারণ বলশালী না হইলে সে তাঁহাকে তখনই দশ হাত দূরে ছুড়িয়া ফেলিত। সঙ্গে সঙ্গে ধৃত-কারীকে মারিবার জন্য সে বাম হস্তে ঘুসি তুলিয়াছিল। মিঃ বোস আততায়ীর আক্রমণ হইতে কৌশলে আত্মরক্ষা করিলেন এবং বুকপকেট

হইতে 'সিটি' লইয়া সজোরে বাজাইয়া দিলেন। গোলমাল শুনিতে পাইয়া দুইজন কনেষ্টবল সেইদিকে পূর্ব্বেই আসিতেছিল। 'সিটির' শব্দে তাহারা তৎক্ষণাৎ মিঃ বোসের কাছে ছুটিয়া আসিল। মিঃ বোস তাহাদের সাহায্যে ব্যাগ হইতে হাতকড়ি বাহির করিয়া আসামীর মুষ্টিবদ্ধ হাতখানায় তৎক্ষণাৎ পরাইয়া দিলেন।

এবার ধৃতব্যক্তির মুখ চক্ষু যেন নিমেষে মৃতের ন্যায় বিবর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। সে রুখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "একি? একি করছেন আপনি কি পাগল হয়েছেন? একজন নির্দ্দোষী ভদ্রলোককে আপনি চোর জালিয়াতের মত গ্রেপ্তার করছেন কোন অধিকারে?"

তাহার তর্জ্জন গর্জ্জনে দৃক্‌পাত না করিয়া মিঃ বোস কনেষ্টবল-দিগকে আসামীকে পুলিশ ষ্টেশনে লইয়া চলিতে বলিলেন। কিন্তু আসামী একপাও নড়িল না,—সে রোষে অপমানে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় লাল হইয়া ক্রুদ্ধ শার্দ্দুলের মত লাফাইয়া উঠিয়া গর্জ্জন পূর্ব্বক বলিল, "বলুন আমার কথার উত্তর দিন! আপনি ত ভাল করেই জানেন আমি কে? তবে আমাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ষ্টেশনে নিয়ে যাচ্ছেন আপনি কি অধিকারে?" মিঃ বোস সে প্রশ্নের উত্তর মুখে দিয়া তাঁহার সিলভার 'ক্রাউন' বাহির করিয়া দেখাইলেন। জনতার মধ্যে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন ক্রাউন দেখিবামাত্র তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এঃ! ডিটেক্‌টিভ বোস। তবেই হয়েছে! আর ছাড়ান ছুড়োন নেই বাবা!" কথাটা শুনিয়া আসামীর উত্তেজনাদীপ্ত রোষারক্ত মুখখানা এককালে শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। পূর্ব্বের সে ঔদ্ধত্য ও আস্ফালন পরিহার করিয়া সে অপেক্ষাকৃত নম্র কণ্ঠে মিনতির স্বরে বলিল, "আপনি ভুল করেছেন মশাই, না বুঝে নিয়ে ভুল করেছেন। আমি

বাস্তবিক নির্দ্দোষী। আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ আপনি শীঘ্রই পাবেন, তখন আপনার এ অবিবেচনার জন্যে ভয়ানক অনুতাপ করতে হবে।”

মিঃ বোস তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তাহাকে অবিলম্বে পুলিশ অফিসে লইয়া আসিলেন। আসামীর সঙ্গের জিনিস পত্র যাহা ষ্টেশনে প্ল্যাটফরমে কুলির জিম্মায় রাখা ছিল, তাহা সেইখানে আনান হইল। বেডিং, সুটকেস্, আসামীর পোষাক পরিচ্ছদ, পায়ের ব্রাউন লেদারের ভারি বুট জোড়া সমস্তই খুলিয়া খানাতল্লাসী লওয়া হইল। কিন্তু জাল নোট বা অপর কোনও সন্দেহজনক দ্রব্য পাওয়া গেল না। মিঃ বোস এবার একটু চিন্তিত হইলেন, দ্বিধায় পড়িলেন। তিনি অপরাধীকে বামাল সহিত গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কেবল এই প্রমাণই যে এক্ষেত্রে যথেষ্ট নহে, ইহাও মনে মনে বুঝিতেছিলেন। অবশ্য অপরাধী দাগী আসামী হইলে দ্বিধা বা সংশয়ের কারণ ছিল না, কিন্তু যুবক ইতিপূর্ব্বে কোনও অভিযোগে রাজদ্বারে অভিযুক্তও হয় নাই, দণ্ডিত হওয়া ত দূরের কথা, সে একাজে নূতন ব্রতী, সুতরাং আসামীর বিরুদ্ধে আরও প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত মিঃ বোস সুস্থির হইতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু তিনি হাল ছাড়িলেন না। দীনদয়াল ও হাওড়া ষ্টেশনের সেই বুকিং ক্লার্ক সম্ভবতঃ আসামীকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে, এই ভরসায় তিনি আসামীকে লইয়া এই গাড়ীতে কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়াই উচিত বিবেচনা করিলেন। ষ্টেশন মাষ্টারকে বলিয়া একখানি মধ্যম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করাইয়া মিঃ বোস আসামী ও একজন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া কলিকাতা রওয়ানা হইলেন।

পনেরো

শৃঙ্খলিত আসামীকে যখন তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল, তখন তাহার অবস্থা অনেকটা আনায়বদ্ধ সিংহের অনুরূপ। ডিটেক্‌টিভ মহাশয়কে এই ধৃষ্টতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অচিরেই সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। কলিকাতায় পঁহুছিয়াই তাঁহার নামে মানহানির অভিযোগ আনিয়া ডিটেক্‌টিভকে সে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া তবে ছাড়িবে, নিষ্ফল আক্রোশে আসামী ক্রমাগত এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল। রুদ্ধ রোষে. উত্তেজনা বশে তাহার হাতকড়ি বদ্ধ হাতখানার লৌহ শৃঙ্খল থাকিয়া থাকিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহার শাসন তর্জ্জনে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া মিঃ বোস বন্দীর শিকল নিজহস্তে ধরিয়া তাহার পার্শ্বে সতর্ক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার মত ধূর্ত্তকে কনেষ্টবলের জিম্মায় ছাড়িতে ভরসা হইল না। দেরাদুন হইতে হরিদ্বার যাইবার পথে দুইটী 'টনেল' পড়ে, একটী ছোট একটী বড়। 'টনেলে'র অন্ধকারে চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়াও তাহার মত সাহসী ও বলিষ্ঠ যুবকের পক্ষে বিচিত্র নহে। যদিও তাহাতে প্রাণের আশঙ্কা যথেষ্ট, কিন্তু একজন বিশিষ্ট ভদ্রসন্তান যাহার মান. অপমানের জ্ঞান আছে, এমত অবস্থায় পড়িলে সে যে প্রাণের মায়া অনায়াসেই ত্যাগ করিতে পারে।

তাই মিঃ বোসের একান্ত ইচ্ছা ছিল, বন্দীকে মাঝখানে বসাইয়া নিজে জানালার দিকে বসেন, কিন্তু সে এপ্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইল না। বলিল একেতো এই দুর্ঘটনায় তাহার মাথা খারাপ হইবার

উপক্রম হইয়াছে, তাহার উপর যদি এসময়ে একটু খোলা বাতাসও না পায়, তবে সে এই মুহূর্ত্তে হয়তো পাগল হইয়া যাইবে, নয় তো দম ফাটিয়া মরিবে। সুতরাং বাধ্য হইয়াই মিঃ বোস আসামীকে জানালা হইতে একটু তফাতে বসিতে দিয়া নিজে তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং কনেষ্টবলকে ঠিক তাহার সম্মুখের বেঞ্চে বসাইলেন। খানিকক্ষণ আরও আস্ফালন করিয়া যুবক বোধ হয় শ্রান্ত হইয়াই চুপ করিল এবং বেশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। উত্তেজনার পর অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। বন্দীকে এতক্ষণ পরে শান্তভাব ধারণ করিতে দেখিয়া কনেষ্টবল কতকটা নিশ্চিন্ত হইল, কিন্তু মিঃ বোস তাহার এই স্তব্ধভাবে যেন আরও সশঙ্কিত হইয়া রহিলেন।

বক্র বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া, নিভৃত গিরিকন্দরে বিকট প্রতিধ্বনি জাগাইয়া ট্রেণখানি পূর্ণ বেগে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিল। কয়েকটী ষ্টেশনের পর বড় 'টনেল'টীর কাছাকাছি আসিয়া মিঃ বোস আরও সতর্ক হইয়া বসিলেন। গাড়ীখানা একটা তীব্রধ্বনি তুলিয়া সাঁ-ৎ করিয়া সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিতেই তিনি বন্দীর হাতকড়ির শিকল খুব শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিলেন, বাহিরে দিনের আলো তখনও নিঃশেষিত না হইলেও সুরঙ্গের ভিতর অমানিশার ঘোর অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আছে। সে সূচিভেদ্য নিবিড় অন্ধকারে কোলের মানুষও দেখা যায় না। অধুনা যেমন পার্ব্বত্য পথগুলির মধ্যে অবস্থিত 'টনেলে'র প্রবেশ মুখেই গাড়ীতে আলো জ্বালিয়া দেওয়া হয়, তখনকার দিনে এ নিয়ম ছিল না, কয়েকটী দুর্ঘটনা ঘটিবার পর রেলকোম্পানী বাধ্য হইয়া এখন এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সেই গহন ঘন তমিস্ররাশির নিকষ কালো বুকখানা সজোরে চিরিয়া নিভৃত সুড়ঙ্গের জমাট বাঁধা গভীর স্তব্ধতাকে ধ্বনিত আলোড়িত করিয়া

ট্রেণ যখন সুড়ঙ্গ-পথ দ্রুত অতিবাহিত করিতেছিল, তখন মিঃ বোস চলন্ত গাড়ীর জলদ গম্ভীর গুম্ গুম্ শব্দের মধ্যে যেন আরও একটা কিসের অস্পষ্ট শব্দ শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু বন্দীর শিকল তাঁহার হাতে, সুতরাং চিন্তার কোনও কারণ ছিল না।

পরক্ষণেই অন্ধকার 'টনেল' অতিক্রম করিয়া ট্রেণখানি মুক্ত পথে, মুক্ত আলোকে আসিয়া পড়িতেই মিঃ বোস দেখিলেন, আসামী যেখানকার সেইখানে বসিয়া আছে, কিন্তু তাহার দক্ষিণ পদ অনাবৃত, পাদুকাবিহীন। সম্ভবতঃ সুড়ঙ্গপথে সেই ভারি বুট জুতা নিক্ষেপের শব্দই মিঃ বোস শুনিতে পাইয়াছিলেন।

বন্দীর বিমর্ষ উদাস মুখের দিকে চাহিয়া মিঃ বোস বলিলেন, "ব্যাপার কি? জুতো খুলে তুমি কি গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়বার মতলব করেছিলে নাকি?"

যুবক বিবর্ণমুখে ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিল, "মতলব করেছিলুম নিশ্চয়, কিন্তু কাজে তা ঘটে উঠল কই! 'টনেল'টা যদি আর খানিকটা লম্বা হতো!"

মিঃ বোস গম্ভীরভাবে কহিলেন, "কিন্তু চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়লে বিশেষতঃ ঐ অন্ধকার সরু সুড়ঙ্গের মধ্যে, তোমার কি দশা হতো তা জানো?"

"জানি নিশ্চিত মৃত্যু তার বাড়া তো কিছু নয়?"

"তুমি মৃত্যুভয় করো না?"

"না, আমার মত হতভাগার যে এখন মৃত্যুই প্রার্থনীয়! এত দুঃখ, এত অপমান সয়েও আমি যে এতক্ষণ বেঁচে আছি কেমন করে তাই ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি!"

মিঃ বোস দেখিলেন, বন্দীর সেই ব্যথা ভরা আক্ষেপোক্তি কপট নহে

আন্তরিক। এবং সে নিজের যে পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছিল, তাহাও যথার্থ, সে বাস্তবিক একজন ভদ্র-সন্তান।

মিঃ বোস বন্দীর দুঃখে দুঃখিত হইলেন, একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্র যুবকের এই শোচনীয় অবনতি তাঁহাকে বস্তুতঃই ব্যথিত করিল। সহানুভূতি ভরে যুবকের পানে চাহিয়া তিনি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন, এই সুন্দর সুশোভন্ কৃতবিদ্য তরুণ যুবক, যদি এই হীনকার্য্যে লিপ্ত না হইয়া তাহার এই বলিষ্ঠ শক্তিমান্ দেহ, কষ্টার্জ্জিত বিদ্যা, এবং অসাধারণ তীক্ষ্ণ ধীশক্তি অন্য কোনও ভাল কাজে নিয়োজিত করিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সে তাহার জীবনকে কতখানি উন্নত ও গৌরবান্বিত করিতে পারিত। একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া মিঃ বোস কোমল স্বরে বলিলেন, "আত্মহত্যা মহাপাপ জানো তো? একতো তুমি না বুঝে যা দোষ করেছ—"

"এখনো বলছি আমি নির্দ্দোষী, এ জাল নোটের আমি কিছুই জানি না মশাই? আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে অব্যাহতি দিন।"

"ব্যস্ত হয়ো না, কল্‌কেতায় গিয়ে তোমার নির্দ্দোষিতা যদি বাস্তবিক প্রমাণিত হয়, তাহলে তখন তোমাকে কার সাধ্য ধরে' রাখে? তোমার সঙ্গে আমার তো কোনও রকম শত্রুতা নেই, আর তা থাকলেও গবর্ণ-মেণ্টের রাজ্যে বে-আইনী করে' কেউ কাউকে দণ্ডিত করতে পারে না।"

নিজের শৃঙ্খলিত হাতখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যুবক শিহরিয়া উঠিয়া সসঙ্কোচে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু কল্‌কেতায়— সেখানেও কি আমাকে এম্নি করে, এই বন্দীবেশেই নিয়ে যাবেন?"

মিঃ বোস ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "অগত্যা।"

"না, না, উঃ! সে যে আমি কখনই পারব না!" মিঃ বোসের দিকে মিনতি করুণ নেত্রে চাহিয়া যুবক আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "দোহাই

আপনার মিঃ বোস! এখানে আমাকে নিয়ে আপনি যা খুসী তাই করুন, কিন্তু হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছুবার আগেই অন্ততঃ আমার হাতের হাতকড়িটা দয়া করে আপনি খুলে দেবেন, নইলে সেখানে আমি মুখ দেখাব কেমন করে, আমি যে লজ্জায় একেবারে মরে যাব মিঃ বোস!"

তাহার এই কাকুতি মিনতি ডিটেকটিভের অন্তর স্পর্শ করিলেও তিনি বিচলিত হইলেন না। নিজ কর্ত্তব্যে অটল থাকিয়া মিঃ বোস বলিলেন, "এবিষয়ে তোমার অনুনয় বিনয় করাই বৃথা। কারণ আমার যা কর্ত্তব্য, তা আমাকে বাধ্য হয়েই পালন করতে হবে।"

যুবক তাহার হাতকড়ি-বদ্ধ হাতের সহিত অন্য হাতখানি যুক্ত করিয়া সজল চক্ষে কাতরভাবে বলিল, "কিন্তু আপনি আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করুন মিঃ বোস! আপনার যাতে কর্ত্তব্য হানি হয় এমন কাজ আমি কখনই করব না! আপনার কাছে শপথ করে' বলছি আমি যদি সে সময় পালাবার চেষ্টা করি তাহলে—"

বাধা দিয়া মিঃ বোস একটু ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ করে বসে থাকো, যা হতে পারে না, তার জন্যে বৃথা বাক্যব্যয় করে কোনই লাভ নেই।"

হতাশ্বাস হইয়া যুবক নিরস্ত হইল। গাড়ীর গতির সহিত দ্রুত ধাবমান বহির্দৃশ্যের দিকে উদাস শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া সে নীরবে বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। পথে আর কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটিল না। সুদীর্ঘ পথ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া মিঃ বোস ক্রমে তাঁহার গন্তব্য স্থলের কাছাকাছি আসিয়া পড়িলেন।

তিনি দেখিলেন, গাড়ীখানি কলিকাতার যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, বন্দী যুবকের অস্থিরতা ও উদ্বেগ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। দারুণ হতাশে ও গভীর বিষাদে তাহার সুন্দর মুখকান্তি একেবারে ম্রিয়মাণ আচ্ছন্ন

হইয়া গিয়াছে। হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিবার পূর্ব্বে সে বাম পদের বুটও খুলিয়া ফেলিল, বলিল একপায়ে জুতা রাখা অসম্ভব। মিঃ বোস সে জুতা ফেলিতে দিলেন না, কনেষ্টবলের জিম্মায় রাখিয়া দিলেন।

যথাসময়ে ট্রেণ হাওড়া প্লাটফরমে প্রবেশ করিল। যুবক সাগ্রহে শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "ষ্টেশন থেকে কতদূর যেতে হবে? গাড়ী করবেন তো?" মিঃ বোস মাথা নাড়িতেই সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "বলেন কি? এই বেশে এই অবস্থায় কয়েদীর মতই আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব? তার চেয়ে আমাকে এইখানেই গলা টিপে মেরে ফেলুন না কেন?"

মিঃ বোস গম্ভীরভাবে কহিলেন, "কথাটা মনে রেখে কাজ করলে আজ এ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'ত না বোধ হয়।"

যুবক অধীর হইয়া মিনতি ভরে বলিল, "যাই বলুন, কিন্তু হেঁটে আমি এক পাও যেতে পারব না মশাই! আমি নিজের পয়সায় গাড়ীভাড়া করব আপনি আমার এ মিনতিটুকু রাখুন শুধু—"

শৃঙ্খলিত করে, বিশৃঙ্খল কেশবেশে, নগ্নপদে বন্দী যুবক যখন হাওড়া ষ্টেশনের জনতাপূর্ণ প্লাটফরমে অবতীর্ণ হইল, তখন তাহার মুখ চক্ষু মৃতের মত বিবর্ণ পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। দুঃসহ লজ্জায় নিদারুণ অপমানে সে যেন আর মাথা তুলিতে পারিতেছিল না।

সেই কান্তিমান্ রূপবান্ ভদ্র যুবককে তদবস্থায় দেখিয়া দর্শক মাত্রেরই মনে অতর্কিতে একটা ব্যথা ও হাহাকার জাগিয়া উঠিল। সহানুভূতিপূর্ণ করুণ দৃষ্টিতে সকলেই সেই লজ্জায় নতশির অপমানাহত তরুণ বন্দীর দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। যুবকের সেই অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি, সুশোভন পরিচ্ছদ, মহার্ঘ হীরকাঙ্গুরীয় কিছুই যেন তাহার তখনকার অবস্থার সহিত খাপ খাইতেছিল না।

মিঃ বোসের প্রথম উদ্যম ব্যর্থ হইল। সেই বুকিং ক্লার্ক যে এই লোকটার কাছে সেদিন জাল নোটখানি পাইয়াছিল, আসামীকে দেখিয়া সে ঠিক বলিতে পারিল না, যে এ লোক সেই।

এখন শুধু দীনদয়ালের স্মরণ শক্তির উপর এ মামলা নির্ভর করিতেছে সে যদি আসামীকে দেখিয়া চিনিতে পারে তবেই তাহার অপরাধ প্রমাণিত হইবার আশা করা যায়।

মিঃ বোস ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশ আফিসে লইয়া গেলেন। সেখানে তাহাকে এবং বাছিয়া বাছিয়া তাহারই সমবয়স্ক ও সম আকৃতি কয়েকজন লোককে একইরূপ সাদা পোষাক পরাইয়া হাজতে দীনদয়ালের সম্মুখে হাজির করা হইল, কিন্তু দীনদয়াল তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের মধ্যে আসামী যে কে তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারিল না। না পারাই সম্ভব, কারণ দীনদয়াল যখন যুবকের কাছে নোট ভাঙ্গাইতে যায়, তখন গাড়ী ছাড়িবার ভয়ে সে এতই ব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যে নোটদাতার চেহারার দিকে লক্ষ্য করিবার মত অবস্থা বা সময় তাহার মোটেই ছিল না।

দীনদয়ালের কাছে নিরাশ হইয়া মিঃ বোস আসামীর নিকট হইতে তাহার পিতার নামে একখানি পত্র লিখাইয়া লইলেন, এই মর্ম্মে যে ভাগ্যদোষে ও দৈব-দুর্ব্বিপাকে সে জাল নোট চালানের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে সেজন্য পিতার কাছে সে সাহায্যপ্রার্থী।

মিঃ বোস নিজেই পত্রবাহক হইয়া কে, পি, চৌধুরীর নিকট চলিলেন। তাঁহার মনে খুব আশা হইল, এইবার এ জটিল রহস্যময় জালসাজির মামলার একটা কিনারা করিতে পারিবেন। কিন্তু সে আশা তাঁহার পূর্ণ হইল না। চৌধুরীমহাশয়ের যে ভৃত্যের দ্বারায় তিনি পত্রখানি ভিতরে পাঠাইয়াছিলেন, সে অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া

পত্রখানি মিঃ বোসের হাতে ফেরৎ দিয়া বলিল, "প্রভু বলিলেন এপত্রের কোনও উত্তর নাই।"

মিঃ বোস গৃহস্বামীর একবার সাক্ষাৎ কামনা করিলে তিনি তাহাও অস্বীকার করিলেন। ডিটেক্‌টিভ অবশেষে নিরুপায় হইয়া সেই ভৃত্যের শরণাপন্ন হইলেন। ভৃত্যটী পুরাতন, সে বহুদিন যাবৎ এসংসারে কাজ করিতেছে। সুতরাং মনিবের ঘরের অনেক খবরই সে রাখিত। কিন্তু তাহাকে দুইটী মুদ্রা দক্ষিণা দিয়া, ও মিষ্টবচনে তুষ্ট করিয়া মিঃ বোস শুধু এইটুকু জানিতে পারিলেন যে, আসামী অরুণপ্রকাশ চৌধুরীমহাশয়ের একমাত্র বংশধর হইলেও নিজ ভাগ্য বা স্বভাবদোষে পিতার ত্যাজ্য-পুত্র। প্রায় সাত আট মাস হইয়া গেল পিতা পুত্রে মুখ দেখাদেখি নাই। কেবল পিতাই নহে, পিতৃপরিত্যক্ত, ভাগ্যহীন অরুণকে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এককালীন সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছে। তাই সে সকলের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া ভবানীপুরে—লেনে একটী স্বতন্ত্র বাসা লইয়া একাকী বাস করিতেছে। বাসার নম্বর ভৃত্য বলিতে পারিল না।

একটা নূতন সূত্র পাইয়া মিঃ বোস সেই বাসার সন্ধানে বাহির হইলেন। বিস্তর খোঁজ করিয়া তিনি সেই বাড়ীও আবিষ্কার করিলেন, কিন্তু দেখিলেন বাড়ীখানি বন্ধ দরজায় 'টু লেট্' ভাড়ায় দেওয়া যাইবে লেখা। বাড়ীওয়ালার ঠিকানা লইয়া মিঃ বোস তাঁহার ভাড়াটিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু অরুণের বিষয় তিনি বিশেষ কিছুই জানিতেন না, শুধু এইটুকু বলিতে পারিলেন গত আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে অরুণপ্রকাশ নামে একটী যুবাপুরুষ তাঁহার বাড়ীখানি ভাড়া লইয়াছিল, এবং সকল সময় সে বাড়ীতে না থাকিলেও ভাড়া ঠিক্ মাসে মাসেই দিয়াছে। তাহার পর ছয় সাত দিন হইল একটী অল্প বয়স্কা ভদ্র-মহিলা

স্বয়ং আসিয়া বাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়াছেন এবং বাড়ীর আসবাব পত্র সমস্তই রাতারাতি তুলিয়া লইয়া বাড়ী খালি করিয়া দিয়াছেন।

সে স্ত্রীলোকটী কে এবং কোথায় থাকেন বাড়ীওয়ালা তাহা বলিতে পারিলেন না। তবে মেয়েটীর বয়স উনিশ কুড়ির বেশী হইবে না, দেখিতে খুব সুন্দর, মিঃ বোস এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিলেন।

মিঃ বোস বাড়ীওয়ালার কথার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন না, বন্ধ বাড়ীখানি খুলাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন কিন্তু সেখানে অরুণের পরিত্যক্ত কোনও কাগজ পত্র বা ব্যবহার্য্য বস্তু কিছুই মিলিল না। মেয়েটী সমস্তই একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া গিয়াছে।

হতাশ হইয়া মিঃ বোস স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেরাদুন রেলপুলিশ অফিসে এই মর্ম্মে একখানি টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন যে অমুক 'টনেলে'র মধ্যে ভাল করিয়া সন্ধান করা হউক, ব্রাউন লেদারের এক পাটী ভারি বুটজুতা সেখানে পড়িয়া আছে কি না। তাহার উত্তর যথাসময়ে আসিল, 'পাওয়া গেল না' মিঃ বোস দেখিলেন বেচারী দীনদয়াল সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইলেও এ দণ্ড বিধাতা তাহার অদৃষ্টেই মাপাইয়া রাখিয়াছেন। এখন একমাত্র আশা যদি সেই মহিলাটীর সন্ধান করিয়া তাহার কাছে এ জালসাজির কোনও প্রমাণ বাহির করা যায়। কিন্তু তাহাও সময় সাপেক্ষ, কারণ মেয়েটী কে, কোথায় থাকে, আসামীর সহিত তাহার কিরূপ সম্পর্ক, সমস্তই তাঁহার অজ্ঞাত। মিঃ বোস এবিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য অগত্যা এক সপ্তাহের রিম্যাণ্ড চাহিয়া লইলেন, এবং মামলা তদ্বিরের ধারা ভিন্নপথে পরিচালিত করিলেন।

ষোলো

দিন দুয়েক পরে, ডিটেক্‌টিভ মিঃ বোস যখন তাঁহার অফিস ঘরে বসিয়া জরুরী কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন, তখন ভৃত্য আসিয়া জানাইল একটী ভদ্রমহিলা তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থিনী। মিঃ বোস মহিলাটীকে সেইখানেই পাঠাইয়া দিতে বলিলেন, এবং হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মিনিট কতক পরেই ঘরে প্রবেশ করিল একটী অপরূপ রূপসী তরুণী, তাহার বেশ ভূষার কিছুমাত্র আড়ম্বর বা পারিপাট্য ছিল না। পরম সুন্দর মুখখানি সুগভীর মর্ম্মব্যথা ও নিবিড় বিষাদচ্ছায়ায় বাসিফুলের মত বিরস বিমলিন হইয়া গিয়াছে। তথাপি সেই শুভ্রবেশা, আলুলায়িতকেশা বিষাদিনী তরুণীর ব্যথা ভরা লাঞ্ছিত রূপরাশি যেন নিশান্তের শিশির সিক্ত শুভ্র রজনীগন্ধার মত একটা করুণ কমনীয় শ্রী, ও স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে ভরিয়া সুন্দরতম হইয়া উঠিয়াছিল।

তরুণী ডিটেকটিভ মহাশয়কে সসম্মানে নমস্কার করিয়া বিনয়-নম্র মধুর কণ্ঠে বলিল, "আমি কি অসময়ে এসে আপনার কাজের ব্যাঘাত করলুম! কিন্তু আমার অবস্থা বুঝে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন মিঃ বোস! আমি বড় অসহায়, বড় বিপন্ন!"

মিঃ বোস প্রতিনমস্কার করিয়া অপরিচিতাকে বসিতে বলিলেন এবং তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলেন। তরুণী শ্রান্তভাবে পার্শ্বস্থ আসনে বসিয়া পড়িল। তাহাকে বস্তুতঃই বড় ব্যাকুল ও বিপন্ন বোধ হইতেছিল। একবার সন্দিগ্ধভাবে এদিক্ ওদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া সে বোধ হয় দেখিয়া লইল সেখানে আর দ্বিতীয় লোক কেহ আছে কি না। তাহার পর ব্যাকুলতায় ভরা দীর্ঘায়ত নয়ন দুইটীর করুণাপ্রার্থী

দৃষ্টি মিঃ বোসের দিকে নিবদ্ধ করিয়া সে ব্যগ্র কাতর স্বরে বলিল, "আমি আজ বড় আশা করে আপনার কাছে এসেছি মিঃ বোস ! আমার জীবন-সর্ব্বস্বের জীবন ভিক্ষা নিতে—" তরুণী কথাটা শেষ করিতে পারিল না, মরমের রুদ্ধ বেদনা যেন বুকের কাছে ঠেলিয়া উঠিয়া সে মধুর কণ্ঠস্বর রোধ করিয়া দিল।

সুন্দরী তরুণীর সেই কাতরতা মিঃ বোসের অন্তর স্পর্শ করিল।

তিনি আশ্বাস পূর্ণ কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "আমার কাছে আপনার কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ করবার কারণ কিছুই নেই। আপনি কার কথা বলছেন, বলুন।"

তরুণী একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "যিনি জাল নোট চালান করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন—"

"ও বুঝেছি, আপনি অরুণপ্রকাশ চৌধুরীর কথা বলছেন ?"

"হ্যাঁ, তাঁর জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি, আপনি তাঁকে কি বাস্তবিকই দোষী মনে করছেন ?"

তরুণীর ব্যথাবিধুর নয়নদুটীর পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মিঃ বোস কহিলেন, "মাপ করবেন, তিনি কি আপনার স্বামী ?"

তরুণীর প্রভাতের শুকতারার মত নিষ্প্রভ মুখখানিতে একটুখানি লজ্জা বা সুখের অরুণিমা চকিতে জাগিয়া উঠিল। পরক্ষণেই দ্বিগুণ বিষাদে অচ্ছিন্ন হইয়া সে সাশ্রুনেত্রে কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "না সে সৌভাগ্যলাভ আমার দুরদৃষ্টে এখনো হয় নি, কিন্তু আমি জানি, আমার পরম বিশ্বাস তাঁকে একদিন স্বামীরূপে আমি পাব, নিশ্চয়ই পাব। আমার এই সর্ব্বত্যাগী একনিষ্ঠ সাধনা কখনই ব্যর্থ নিষ্ফল হবে না। কিন্তু আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে দয়া করুন।"

"আপনার সমস্ত কথা আমাকে না জানালে আমি কি করে' কি করতে পারি বলুন? আপনার পরিচয় এখনও—"

"আমি আপনাকে সমস্তই বলছি মিঃ বোস! ভাল মন্দ কোনও কথাই আমি আপনার কাছে গোপন করব না।"

বাস্তবিক বেলা কিছুই গোপন করিল না। এই বিপদের দিনে সাহায্যের প্রত্যাশায় লজ্জা মান অপমানের ভয় না রাখিয়া সে তাহার নাম ধাম, এবং ধনিনন্দন অরুণের সহিত পরিচয়, তাহার প্রতি অরুণের অন্ধ আসক্তি, সেই আসক্তি বশে পিতার সহিত মনান্তর, সেই মনান্তরের ফলে জন্মের মত পিতৃগৃহ, পিতৃসংস্রব পরিত্যাগ, তাহার পর উদরান্নের সংস্থান জন্য কলেজ ছাড়িয়া চাকুরী অন্বেষণ, চাকুরী না পাইয়া মাতৃ-দত্ত অর্থে ব্যবসায় আরম্ভ, ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঋণ গ্রহণ, এবং ঋণের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া বিপথে পদার্পণ, আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনীই সে ডিটেক্টিভের সাক্ষাতে যথাযথ বিবৃত করিল।

মিঃ বোস বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন, নারীর মুখে, নারী-প্রেমের এমন উজ্জ্বল করুণ কাহিনী তিনি বোধ হয় আর কখনও শুনিতে পান নাই। একটা সমবেদনার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু যে লোকটা আপনার জন্যে এত বড় রাজসম্পদ, সম্মান প্রতিষ্ঠা অনায়াসে ত্যাগ করতে পারলে, সেই যে শেষকালে আপনাকে বিবাহ করতে কেন—"

বাধা দিয়া বেলা আদ্র্র কণ্ঠে কহিল, "সে আমারই দুর্ভাগ্যের ফল। তাঁর কাছে যে ভালবাসা পেয়েছিলুম, তার তুলনা হয় না, কিন্তু অভাগীর ভাগ্যে বুঝি তা সহ্য হল না! নির্দ্দয় বিধাতা কাঙ্গালিনীকে অমূল্য রত্ন দিয়েও আবার বঞ্চিত করলেন। মিঃ বোস! আপনি জানেন না আমি কত, কত অভাগিনী!"

বেলা আর বলিতে পারিল না, তাহার নীলোৎপল নয়ন দুটী ছাপাইয়া উঠিয়া বেদনার অশ্রুধারা ঝর ঝর ঝরিয়া পড়িল। মিঃ বোস আন্তরিক দুঃখিত হইয়া সহানুভূতি কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু তার জন্য আপনার দুঃখ করা অনুচিত মিস্ রায়! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন, যে আপনি অল্পে অল্পেই পরিত্রাণ পেয়ে গেছেন, নইলে তার মত অপদার্থ নরাধম আপনার স্বামী হলে—"

ব্যথাবিদ্ধ আর্ত্তকণ্ঠে বেলা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না না, ওকথা বলবেন না মিঃ বোস! আপনার চক্ষে, জগতের চক্ষে সে অপদার্থ নরাধম হ'তে পারে,—কিন্তু আমার কাছে সে যে স্বর্গের দেবতা! আমি যে এখনো কায় মন প্রাণ দিয়ে তাঁকে দেবতা বলেই পূজা করি,—আর চিরদিন চিরজীবন তাই করব, আমার পূজার দেবতাকে আপনি এমন করে' পথের ধূলায় টেনে ফেলে দেবেন না মিঃ বোস!"

মিঃ বোস নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে গভীর শ্রদ্ধায় সেই দীনা, মলিনা অশ্রু-বিগলিত-নয়না প্রেমময়ী নারীমূর্ত্তির পানে অপলকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুগ্ধ চক্ষে সে মূর্ত্তি যেন স্বর্গভ্রষ্ট দেববালার মতই সুন্দর পবিত্র ও মহিমময় প্রতীয়মান হইতেছিল।

বেলা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে ব্যথিত স্বরে ধরা গলায় বলিল, "আপনি শুধু তাঁর মন্দ দিকটাই দেখেছেন, ভাল দিক তো দেখেন নি, দেখলে বুঝতে পারতেন তাঁর মন কত উঁচু, অন্তর কত মহৎ। তাঁর এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, শোচনীয় অধঃপতনের জন্যে প্রধানতঃ আমিই দায়ী। তাই তাঁকে এ পথ থেকে ফেরাবার জন্যে আমি কি না করেছি? কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারি নি। ভগবান্ অবলা নারীর প্রাণে করবার শক্তি কতটুকুই দিয়াছেন; তবে তাঁর বাপ মা যদি এমন করে একেবারে হাল ছেড়ে না দিতেন, আত্মীয় স্বজন সকলেই যদি তাঁকে

পরিত্যাগ না করতেন, তাহলে তাঁর এদশা আজ কথনই হ'ত না, একথা আমি শপথ করে বলতে পারি।"

মিঃ বোস একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যাক্, এখন আপনি আমাকে কি করতে বলছেন তা বলুন।" "কি আর বলব? আপনি তো সবই বুঝছেন! এ দারুণ বিপদে আপনি তাঁকে রক্ষা করুন, তাঁকে বাঁচান মিঃ বোস। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করবেন। আমি আজ আপনাকে ঘুষ দিতে আসিনি,—আমি জানি আপনি সে প্রকৃতির লোক নন, কিন্তু আমার সর্ব্বস্বদিলে, আমার প্রাণ দিলেও যদি তিনি মুক্তি পান, তবে আমি তাও দিতে প্রস্তুত আছি।"

মিঃ বোস সক্ষোভে "বলিলেন, বড় দুঃখের বিষয় মিস্ রায়! আপনার এই অপার্থিব ভালবাসা আপনি অপাত্রে ন্যস্ত করেছেন, সে আপনার পবিত্র প্রেমের মর্য্যাদা—" বেলা আহত হইয়া মরাল গ্রীবা উন্নত করিয়া সগর্ব্বে অবিচলিত স্থির স্বরে বলিল, "কিন্তু আপনি দেখবেন মিঃ বোস যদি আমার এ ভালবাসার যথার্থই কোনও শক্তি থাকে, যদি আমি কায়-মনপ্রাণে শুধু তাঁরই আরাধনা করে থাকি, তাহলে একদিন না একদিন এবিপথ থেকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে আবার দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করব-করব-করব!" বলিতে বলিতে বেলার গর্ব্ব স্ফুরিত উত্তেজনারক্ত সুন্দর মুখখানি পবিত্র প্রেমের দীপ্ত মহিমায় সতীর গরিমায় উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে মুখের পানে চাহিয়া মিঃ বোস একটা ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন এহেন রমণীরত্নকে যে হাতে পাইয়া হেলায় হারাইয়াছে কি দুর্ভাগ্য কি নির্ব্বুদ্ধি সে!

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বেলা পুনশ্চ বলিতে আরম্ভ করিল, "আমি জানি আপনি ন্যায়বান্, বিবেচক, আপনার সততা আর আশ্চর্য্য বিচার-শক্তির প্রশংসা আমি অনেকের কাছেই শুনেছি, কিন্তু সেইজন্যেই আজ

আপনার কাছে আমি আসিনি মিঃ বোস ! এসেছি শুধু করুণার প্রত্যাশী হয়ে, আপনার দয়া না পেলে শুধু একটী নয়, দু দুটী জীবন এখন একেবারে ব্যর্থ নষ্ট হয়ে যাবে।” মিঃ বোস ক্ষুদ্ধ হাস্যে কহিলেন, “কিন্তু আমাদের কাজ, আমাদের কর্ত্তব্য যে কত কঠোর, তা আপনি জানেন না, মিস রায়, তাই আমার কাছে দয়ার প্রত্যাশা করছেন। মনে করুন আসামীর অপরাধ যদি প্রমাণিত হয়ে যায়। তাহলে আমি কি করতে পারি ?”

“আপনি ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারেন মিঃ বোস, করবার ক্ষমতা আপনার বিলক্ষণ আছে। অন্ততঃ তাঁর শাস্তিটা যাতে কম হয়—উঃ ! আর যে আমি পারি না !—ভগবান্ তাঁর অদৃষ্টে শেষে এ লাঞ্ছনা, এ দুর্গতিও লিখেছিলেন !— বলিতে বলিতে মর্ম্মপীড়িতা বেলা অসহনীয় দুঃখে অধীর অবশ হইয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই দুঃখিনী মেয়েটীর এই ব্যথাভরা আকুল রোদন ডিটেক্‌টিভের কঠোর চিত্তকেও করুণায় বিগলিত করিয়া তুলিল কিন্তু তিনি ব্যথিতাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

সতেরো

কতক্ষণে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বেলা চক্ষু মুছিতে মুছিতে করুণ আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "আজ আপনাকে আমি অনেক কষ্ট দিলুম, অনেক সময় আপনার নষ্ট করলুম, সেজন্যে আমাকে, ক্ষমা করুন মিঃ বোস! কিন্তু আপনি একবার বলুন,—বলুন, তিনি আপনার দয়ায় বঞ্চিত হবেন না! আপনার মুখে একটা কথা শুনলে তবু মনে একটু ভরসা পাই, আমি যে এখন সমস্ত পৃথিবী শূন্যময় অন্ধকার দেখছি মিঃ বোস, এবিপদে আমাকে ভরসা দেবার সাহায্য দেবার আর কেউ নেই।"

মিঃ বোস একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিরুপায় দেখিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে মিছে আশ্বাসে ভুলিয়ে রাখতে চাই না মিস্ রায়! তবে যদি বে-আইনী কোনও কাজ না করে' আপনাকে এ বিপদে সাহায্য করতে পারি, তাতে আমি রাজি আছি। কিন্তু মনে রাখবেন গবর্ণমেণ্টের আইন কানুন মেনে চলতে আমি বাধ্য, কারণ আমার—"

"আঃ, তাহলে কি হবে? তাঁকে আমি কেমন করে বাঁচাব?" অশ্রু সজল আর্দ্রনয়নে মিঃ বোসের দিকে চাহিয়া বেলা হতাশ-ক্লিষ্ট করুণ কণ্ঠে বলিল," আপনি আমার অবস্থা দেখে দয়া করুন মিঃ বোস, আমি বড় দুঃখিনী বড় হতভাগিনী।"

মিঃ বোস তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সান্ত্বনাচ্ছলে কহিলেন, "আপনি ধৈর্য্য ধরুন, শান্ত হন মিস্ রায়! তিনি যদি বাস্তবিকই নির্দ্দোষী হন, তাহলে তাঁর মুক্তির উপায় ভগবানই করে দেবেন। আর এখনও

কিছুই বলা যায় না, ঘটনা যে রকম দাঁড়াচ্ছে, তাতে হয়তো আসামীর বিরুদ্ধে আর কোনও বিশেষ প্রমাণ নাও পাওয়া যেতে পারে। তবে, তাঁর দিক্ থেকে যদি একজন ভালো ব্যারিষ্টার—"

"ঠিক বলেছেন, সে ব্যবস্থা আমি শীঘ্রই করছি। আমি আমার সাধ্য মত কোনও ক্রটীই রাখব না। আঃ! আমার প্রাণ দিলেও যদি তাঁকে এ লাঞ্ছনা এ অপমান থেকে রক্ষা করতে পারতুম!—"

এই অপরিচিত ব্যথিতা নারীর দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে মিঃ বোস আসল কাজের কথাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এতক্ষণে স্মরণ হওয়ায় তিনি বেলাকে ধীরে ধীরে বলিলেন," আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মিস্ রায়! ভরসা করি, আপনার কাছ থেকে আমি যথার্থ উত্তর পাব।"

"নিশ্চয়, আমি আপনার সাক্ষাতে এপর্য্যন্ত যত কথা বলেছি তার একটাও মিথ্যা নয়, জানবেন—"

"তা আমি জানি, কিন্তু একটা কথা আমি এখনো ঠিক জান্‌তে পারিনি,"—

"কি কথা বলুন?"

"পিতার সঙ্গে মনান্তর হবার পর মিঃ চৌধুরী ভবানীপুরে যে স্বতন্ত্র বাসা নিয়েছিলেন, সেখানে সম্প্রতি আপনি একবার গিয়েছিলেন না?"

বেলা তাহার অজ্ঞাতে একটু চমকিয়া উঠিল। উদ্বিগ্ন মুখে, শুষ্ক কণ্ঠে সে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, কয়েকদিন হ'ল একবার গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু তাতে কি হয়েছে?"

"কেন গিয়েছিলেন, সে কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"কেন আর ?—অনেকদিন তাঁকে দেখিনি, কোনও খোঁজ খবরও পাইনি, তাই।"

"কিন্তু বাসা ভাড়া চুকিয়ে তাঁর সেখানকার আসবাব পত্র সমস্তই তুলে এনেছেন শুনলুম—"

বেলার চক্ষের জল নিমেষে শুকাইয়া গেল। তাহার অশ্রুরেখাঙ্কিত মলিন মুখে উদ্বেগ ও ভীতির চিহ্ন স্পষ্ট প্রকটিত হইল। চকিত ত্রস্ত স্বরে সে বলিল, "হ্যাঁ, তাতো এনেছিলুম, কি করি বলুন ? সে বাড়ীতে তিনি তো এখন থাক্‌ছেন না—মিথ্যে ভাড়া বাড়িয়ে কি হবে ? তাই জিনিসপত্রগুলো সব তুলে, ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে এলুম।

"জিনিসপত্র সেখানে কি কি ছিল তাঁর ?"

"খাট, বিছানা, ট্রাঙ্ক, ড্রয়ার সবই ঘরকন্নার জিনিস,—বেশী কিছু ছিল না তো !—তিনি একামানুষ,"—

"কিন্তু ঘরকন্নার জিনিস ছাড়া আর কি কিছুই ছিল না ?"

"আর কি থাক্‌বে ?"

"এই কোনওরকম যন্ত্রপাতি—"

বেলা পুনরায় চমকিয়া উঠিল, অতিমাত্র ভীত ও ব্যাকুল হইয়া সে তাড়াতাড়ি বলিল, "যন্ত্রপাতি ! সে আবার কি ? না না, সেখানে সে রকম কোনও জিনিসই আমি পাই নি, মিঃ বোস ! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি স্ত্রীলোক, অসহায়া, এ সঙ্কটে আপনি যদি না কৃপা করেন, তাহলে আমার আর কোনও আশা কোনও উপায় নেই।"

বেলার কথা ও মুখ চক্ষের ভাব দেখিয়া মিঃ বোসের মনে সন্দেহ হইল, সে তাঁহার কাছে একটা কি কথা গোপন করিতেছে। কিন্তু সেই অসহায়া মেয়েটীর আর্ত্ত বিপন্ন অবস্থায়, তাহাকে অতঃপর আর জেরা

করিয়া ব্যথিত বিব্রত করিতে ডিটেকটিভের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হইল না। তাই বেলাকে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা তাহলে আপনি এখন বাড়ী যেতে পারেন,—যদি এর মধ্যে দেখা করবার প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনার ঠিকানাটা—"

"বেলা তাহার বাটীর ঠিকানা লিখিয়া দিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল,—মিঃ বোসের দিকে আশ্বাস ভরে চাহিয়া সে করযোড়ে, মিনতি করুণ স্বরে বলিল, "আচ্ছা তাহলে আসি। আপনি এ অভাগীর কথা ভুলে যাবেন না মিঃ বোস! আর যদি কিছু অর্থ দণ্ড দিলে তিনি আপাততঃ অব্যাহতি পেতে পারেন তাহলে দয়া করে' আপনি প্রথমে সেই চেষ্টাই করবেন কি? তাঁর কষ্ট লাঘবের জন্যে তাঁর মুক্তির বিনিময়ে আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব দান করতে প্রস্তুত আছি জানবেন।"

প্রশংসমান সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে বেলার সুন্দর কাতর মুখখানির পানে চাহিয়া মিঃ বোস বলিলেন, "যদি তা সম্ভব হয় তাহলে আমি আপনাকে শীঘ্রই জানাব মিস্ রায়! সেজন্য আমাকে আর অনুরোধ, উপরোধ করতে হবে না। এখন আপনি আমাকে আপনার একজন হিতৈষী বলেই মনে করবেন।"

মিঃ বোসের এই করুণার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বেলা সাশ্রুনেত্রে, গাঢ় কণ্ঠে কহিল, "ভগবান আপনার মঙ্গল করুন মিঃ বোস! যদি কখনও দিন পাই, নিষ্ঠুর বিধাতা যদি কোনও দিন আবার মুখ তুলে চান, তাহলে আপনার দয়ার ঋণ আমরা দুজনে মিলে পরিশোধ করবার চেষ্টা করব, কিন্তু সেদিন কি আর হবে? তাঁকে আমি কি সত্যিই আবার ফিরে পাব?"

মিঃ বোস ব্যাকুলিতা বেলাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "এ জগতে

কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু আপনি এরকম অধীর হলে তো চলবে না মিস্ রায়! আপনাকে এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে মন স্থির করে তাঁর উদ্ধারের উপায় দেখতে হবে। আপনি ভিন্ন তাঁকে এ বিপদে সাহায্য করতে আর কেউ নেই জানেন তো?"

একটা গভীর ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বেলা বলিল, "ঠিক বলেছেন, তাঁর আর কেউ নেই, ঘৃণা হতশ্রদ্ধা করে' তাঁকে সবাই ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি তো তাঁকে আমার প্রাণ থাকতে ছেড়ে দিতে পারব না। তিনি যতই হীন, তুচ্ছ ঘৃণ্য হ'ন, আমার জীবনের যে তিনি সর্ব্বস্ব, আমার সুখ আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই যে তাঁকেই নিয়ে। তাঁর জন্যে যত কষ্ট, যত লাঞ্ছনা যত অপমান সইতে হয়, সমস্তই আমি হাসিমুখে সহ্য করব, কিন্তু তাঁর আশা শুধু এজন্মে নয় জন্ম জন্মান্তরেও বুঝি ছাড়তে পারব না!"

কক্ষমধ্যে একটা ব্যথাভরা সকরুণ ব্যর্থ প্রেম স্বপ্নের মোহ ছড়াইয়া বেলা সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিল। ডিটেক্‌টিভ এতক্ষণে যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। এই অপরিচিতা তরুণীটার আশ্চর্য্য রূপ, ঐকান্তিক অসাধারণ প্রেম, পাষাণ গলানো অশ্রুভরা কাতর অনুনয় উপরোধ তাহাকে যেন এতক্ষণ অভিভূত বিমূঢ় করিয়া তুলিয়াছিল।

মেয়েটী তাহার কাছে আসিয়াছিল করুণাপ্রার্থিনী হইয়া, কথাটা মনে করিয়া এখন মিঃ বোসের হাসি পাইল। করুণা! দয়া! হোঃ! গুপ্ত গোয়েন্দাগিরি যাহার ব্যবসা, গোপন অনুসন্ধানে দস্যু তস্কর, জালিয়াৎ ও হত্যাকারীর অপরাধ প্রমাণিত করিয়া সমুচিত দণ্ডে দণ্ডিত করানো যাহার কাজ, তাহার কাছে আবার দয়ার প্রত্যাশা! এই মিঃ বোসের বিশ্বাস ছিল দয়া মায়া প্রভৃতি মানব-চিত্তের কোমল

বৃত্তিগুলি শুধু মানসিক দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু আজ এই বিপন্না অসহায়া মেয়েটীকে একটুখানি উৎপীড়ন করিলেই হয়তো এই জালনোট ঘটিত ব্যাপারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেন, তাহা করিলেন না কেন? ইহা ডিটেক্‌টিভের কর্ত্তব্য কঠোর কঠিন চিত্তের দুর্ব্বলতা, না দয়া?

আঠারো

আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়ক অরুণপ্রকাশ উন্নতির অত্যুচ্চ শিখর হইতে একেবারে অবনতির এই অধঃস্তরে আসিয়া পড়িল কেমন করিয়া, পাঠক পাঠিকার কৌতূহল নিবারণার্থে এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। অপরিণত বুদ্ধি তরুণ যুবক অরুণ, যখন সুন্দরী বেলার প্রেমে আত্মহারা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়াই ধন জন প্রতিষ্ঠা স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া অনির্দ্দেশ, অসহায় জীবন-যাত্রায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল. তখন বেলার বিমোহন তরুণ রূপের মাদকতা ও নব জাগ্রত যৌবনের উন্মাদনাময় প্রেমের নেশায় ভরপূর বিভোর হইয়া সে সমস্ত পৃথিবীটাকেই স্বপ্নময় রঙীন দেখিতেছিল। কিন্তু এ ভ্রান্তি তাহার অচিরেই ভাঙ্গিয়া গেল। সে দেখিল, এ সংসার আগাগোড়াই কাব্য বা স্বপ্ন দিয়া গঠিত হয় নাই। সুখের পিয়াসী মানবের জীবন বিষময় করিবার জন্য দুঃখ ক্লেশ অভাব বিপত্তি এপথে স্থানে স্থানে উগ্রবিষ ভুজঙ্গের মত প্রতিনিয়তই মুখব্যাদান করিয়া আছে। তাহাদের উদ্যত করাল গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া লওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার।

তাই অরুণ বেলাকে লইয়া যে স্বতন্ত্র সমাজ [redacted] জগতের কল্পিত সুখরাজ্য মনে মনে রচনা করিয়াছিল, বাস্তবে তাহা গড়িয়া উঠিতে পারিল না। তাহার প্রণয়পাত্রীর কল্যাণ কামনায় সে উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে পরিণীত হইবার বাসনা পরিত্যাগ করিল, এবং প্রাণের উচ্ছ্বসিত অদম্য প্রেম ও আকাঙ্ক্ষা কষ্টে সংযত করিয়া তাহার অসহায় জীবন-যাত্রার পাথেয় সংগ্রহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। কিন্তু কৃত-কার্য্য হইতে পারিল না। অরুণের আবাল্য সুখ-পালিত সুকুমার দেহ,

আত্মসম্ভ্রম-জ্ঞান, এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জীবিকার্জ্জনের পথে তাহাকে পদে পদে বাধা দিতেছিল। চাকরীর আশা ছাড়িয়া দিয়া অরুণ শেষে একটা ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিল। কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধি ও শ্রমসহিষ্ণুতার অভাবে তাহাতে লাভ তো হইলই না, হইল শুধু ক্ষতি। সেই ক্ষতি পূরণার্থে অরুণ অগত্যা কর্জ্জ করিয়া কাজ চালাইতে লাগিল।

অরুণ যে ধনী পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী তাহা সকলেই জানিত, তাই শুধু হ্যাণ্ডনোটের উপর ভরসা রাখিয়া তাহাকে ঋণদান করিতে কেহই ইতস্ততঃ করিল না। কিন্তু ক্রমশঃ ঘটনা পরম্পরায় তাহারা যখন জানিতে পারিল, অরুণের পিতার সহিত অধুনা কোনও সম্বন্ধ নাই, সে নিজ চরিত্র-দোষে পিতার ত্যাজ্যপুত্র, তখন সকলেই একসঙ্গে তাগিদ আরম্ভ করিয়া অরুণকে অতিষ্ঠ ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

বেলা তাহার পৈত্রিক বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে অরুণকে ঋণমুক্ত হইতে পরামর্শ দিল, কিন্তু অরুণ সম্মত হইল না। নিজ অক্ষমতায় সে যাহাকে আজও পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারে নাই, উদ্দাম লালসা ও মোহের বশীভূত হইয়া সে যাহার অনাবিল শুভ্র কুমারী-জীবন, কুৎসা ও কলঙ্কে মলিন করিয়া তুলিয়াছে, তাহার এই সংসার-যাত্রার ক্ষুদ্র সম্বলটুকুও ঘুচাইয়া দিবে সে, এখন কোন্ লজ্জায়? অরুণের আত্মসম্মান ও পুরুষত্ব তাহাকে এই প্রতিদানের আশাহীন দান গ্রহণ করিতে নিবৃত্ত করিল।

মর্ম্মাহত অনুতপ্ত পিতা প্রথম প্রথম পুত্রের খোঁজ খবর লইতেন, এবং এই মায়ামরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া সে যাহাতে নিজ পরিত্যক্ত স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, সে চেষ্টাও তিনি গোপনে গোপনে করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রের প্রবল আত্মাভিমান ও নারীপ্রেমের দুর্জ্জয় আকর্ষণের কাছে পিতার সমস্ত চেষ্টা প্রযত্ন পরাস্ত হইয়া গেল। অভিমানী

অরুণ পিতৃগৃহে আর ফিরিল না, স্বীয় শপথ রক্ষার জন্য সে তাঁহার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিল না। তাহার এই নিষ্করুণ ব্যবহারে চৌধুরী মহাশয় বড়ই রুষ্ট ও অপমানিত বোধ করিলেন। এবং অতঃপর পুত্রের আশা ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন।

পিতা পুত্রের মনান্তর ও বিরোধ এ ঘটনায় একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

অনভ্যস্ত জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া হতভাগ্য অরুণ তাহার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সব ভুলিয়া গেল। যাহাকে সম্বল করিয়া সে একদিন দুস্তর সংসার-সাগরে অনায়াসে ঝাঁপ দিয়াছিল, ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া তাহার সেই প্রেমের ধ্রুবতারাটির প্রতিও আর সে লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিল না। যে অন্ধ আসক্তি ও দুর্নিবার প্রেম তাহাকে গৃহত্যাগী সর্ব্বত্যাগী করিয়াছিল, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তাহাও ক্রমশঃ শিথিল হ্রাস হইয়া আসিল।

অরুণের এই পরিবর্ত্তন সরলা নিরপরাধিনী বেলাকে মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত করিলেও সে অসামান্য সহিষ্ণুতার সহিত অনাদর অবজ্ঞা ও অপমান সমস্তই সহ্য করিতেছিল এবং নিজ জীবনব্যাপী লাঞ্ছনা ও দুঃখ স্বীকার করিয়া প্রিয়তমের মঙ্গলকামনায় তাঁহাকে পরিত্যক্ত পিতৃগৃহে ফিরিয়া পাঠাইতে বিধিমত প্রযত্ন করিতেছিল। কিন্তু বেলার সকল যত্নই নিষ্ফল হইয়াছিল। অরুণ প্রত্যাবর্ত্তন তো করিলই না, অধিকন্তু দুঃখে কষ্টে দিশেহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সে তখন যে পথে পদার্পণ করিল, সে পথ যেমন দুর্গম, তেমনই বিপদসঙ্কুল।

দুঃখিনী বেলার অবিচলিত একনিষ্ঠ প্রেম, তাহার বিপথগামী দয়িতকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। অরুণ দুষ্টবুদ্ধির বশীভূত হইয়া অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা বাবুয়ানী করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং

অবস্থা একটু স্বচ্ছল করিতে পারিলেই পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বেলাকে লইয়া সুখের সংসার পাতিবে, এই স্তোকবাক্যে সে সরলা বেলাকে ভুলাইয়া রাখিল।

কিন্তু পাপ বেশীদিন গোপন থাকে না। অরুণের দুষ্কৃতির বিষয় ধীরে ধীরে বেলা সমস্তই জানিতে পারিল, কিন্তু প্রতিকার করিতে পারিল না। কারণ অরুণ তখন তাহার আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। সে তাহার দুষ্ক্রিয়াসক্ত প্রিয়তমের ভয়াবহ পরিণাম মনে মনে কল্পনা করিয়া যখন উদ্বেগে শঙ্কায় জীবন্মৃত হইয়া দিন কাটাইতে-ছিল, তখনকার এই ঘটনা।

ডিটেক্‌টিভ বোসের নিকট বিদায় লইয়া দুর্ভাগিণী বেলা তাহার আত্মীয় স্বজনহীন সংসারের একমাত্র অবলম্বন একমাত্র সুহৃৎ অবিনাশ বাবুর পায়ে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। বলিল" আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে আপনি তাঁকে বাঁচান জ্যাঠামশায়! এবিপদে তাঁকে রক্ষা করতে এখন আপনি ভিন্ন যে আর কেউ নেই।"

এই কাণ্ডজ্ঞানহীন খেয়ালী ধনিপুত্রটীর দিকে অবিনাশ বাবুর মন পূর্ব্বাবধি বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। এক্ষণে বেলার প্রতি তাহার এই অবিচার ও দুর্নীতি পরায়ণতায় তিনি অরুণের উপর বিষম চটিয়া গিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরম স্নেহের পাত্রী বন্ধুকন্যা বেলার ব্যাকুল মিনতি ও জয়ন্তীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়াই অরুণের মুক্তির জন্য যত্ন লইতে হইল। তিনি জাল নোটের মামলায় অভিযুক্ত অরুণের দিকে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াদিলেন, এবং যতদূর সম্ভব বাঁচাইবার চেষ্টাই করিতেছিলেন, কিন্তু এই সময় অতর্কিতে আর একটী ঘটনা আসিয়া পড়িয়া তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়াদিল।

উনিশ

মিস্ রায়ের সাক্ষাতে কয়েকদিন পরেই মিঃ বোস দেরাডুন পুলিশ অফিস হইতে প্রেরিত একটী পুলিন্দা পাইলেন। পুলিন্দার মধ্যে ছিল সেই ব্রাউন লেদারের ভারি বুটজুতা একপাটী, যাহা দেরাডুন হইতে আসিবার পথে টনেলের মধ্যে আসামী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সঙ্গে এই জুতা প্রাপ্তির বিবরণ আদ্যোপান্ত লিপিবদ্ধ হইয়া আসিল। জুতাটী এইরূপে পুলিশের হস্তগত হইয়াছিল।

মিঃ বোস আসামীকে লইয়া যেদিন দেরাডুন হইতে কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন, তাহার দিন কয়েক পরে স্থানীয় থানেদার ওমরাও সিংয়ের ভৃত্য একখানি পাঁচ টাকার নোট প্রভুকে দেখাইতে লইয়া আইসে এবং ঐ নোটখানি জাল না আসল তাহা জিজ্ঞাসা করে। থানেদার সাহেব একটু লক্ষ্য করিয়াই নোটখানির কৃত্রিমত্ব বুঝিতে পারেন। এনোট ভৃত্য কোথায় পাইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে, মাহিনা পাইয়া ছজ্জুরাম বেণিয়ার দোকানে দশ টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া সে ঘরের জন্য কিছু সওদা খরিদ করে, তারপর সওদা ও বাকী দুইটী টাকা এবং এ পাঁচ টাকার নোটখানা ফেরত লইয়া সে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন মনে পড়িল গত মাসে একজন মহাজনের কাছে সে বিশেষ প্রয়োজনে পাঁচটী টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল, তাহা এই সময় শোধ করা দরকার, নহিলে হয়তো শেষ মাসে দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

কথাটা মনে পড়িতেই সে পাঁচ টাকার নোটখানি তৎক্ষণাৎ গিয়া মহাজনকে দেয়, কিন্তু মহাজন নোটখানির আকার প্রকার দেখিয়া সন্দেহ করেন এবং নোটখানা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া বলেন, "এ নোট

আসল নহে জাল।" তাই সে সত্য মিথ্যা জানিবার জন্য নোটখানি প্রভুর কাছে লইয়া গিয়াছে।

ওমরাওসিং এই জাল নোটের বৃত্তান্ত জানিবার অভিপ্রায়ে ছজ্জু বেনিয়াকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া পাঠাইলেন। থানেদার সাহেবের ডাক পাইবামাত্র ছজ্জুরাম সশঙ্কিত চিত্তে হুজুরে হাজির হইল, এবং বলিল, এ নোটখানি সে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় গয়াদীন সোণারের নিকট পাইয়াছে, দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী ফিরিবার মুখে সে লোকটা এই নোটখানা তাহাকে দিয়া কিছু সওদা লইয়া গিয়াছিল। ছজ্জুরাম বেণিয়াকে ঠকানো বড় সহজ কথা নহে, টাকাতো দূরের কথা এক একটী পাই পয়সা সে বেশ করিয়া দেখিয়া বাজাইয়া তবে বাক্সে তোলে, কিন্তু নোটের কৃত্রিমত্ব ধরিতে পারে সে কিরূপে, তাই এ গলদ ঘটিয়াছে।

এবার গয়াদীন সোণারের ডাক পড়িল। এ নোট যে সেই বেনিয়াকে দিয়াছে, ইহা সে অস্বীকার করিল না, অধিকন্তু বলিল, কেবল এই এক খানাই নহে, এইরূপ আরও দুইখানি নোট সে পাইয়াছে, এবং সে নোট দুইখানি এখনো তাহার ঘরেই আছে। যদি হুজুর দেখিতে চাহেন তবে সে এখনি আনিয়া দেখাইতে পারে।

থানেদারের আদেশ ক্রমে গয়াদীন তাহার বাড়ী হইতে বাকি দুইখানা নোটও লইয়া আসিল। বাস্তবিক তিনখানা নোট একই রকমের। এই নোটগুলি স্যাকরা কোথায় কাহার কাছে পাইয়াছে এ প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল যে, গত কল্য সন্ধ্যার মুখে সে যখন দোকান পাট গুছাইয়া বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিয়াছিল তখন একজন স্ত্রীলোক হন্ত দন্ত ভাবে দোকানে উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকটীকে গয়াদীন চেনে সে তাহাদেরই প্রতিবেশী ছেদি মুচির স্ত্রী।

মুচিবউ ওড়নার খুঁট হইতে এই তিন খানি নোট বাহির করিয়া

চুপি চুপি গয়াদীনের হাতে গুঁজিয়া দেয়, এবং এই পনেরোটী টাকার ভাল চাঁদি কিনিয়া তাহার গলার হাঁসুলী গড়িয়া দিতে বলে। গয়াদীন মুচি বউয়ের হাতে এক সঙ্গে অতগুলি টাকা দেখিয়া মনে মনে কিছু বিস্ময় বোধ করিলেও সে টাকা মুচিবউ কোথা হইতে কেমন করিয়া পাইয়াছে জিজ্ঞাসা করা উচিত বিবেচনা করে নাই।

সে জানিত ছেদি মুচি একজন কারিগর লোক, ভাল জুতা প্রস্তুতও মেরামতের কাজ করিয়া সে বেশ দু'পয়সা রোজগার পাতি করে, কিন্তু কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না, কারণ লোকটা মদ্যপ ও জুয়ারী। তাই মুচিবউ বুদ্ধি করিয়া স্বামীর রোজকার হইতে টাকাটা সিকাটা গোপনে আত্মসাৎ করিয়া গয়াদীনের স্ত্রীর নিকট গচ্ছিত রাখিত। তাহার সেই সঞ্চিত অর্থে গয়াদীন মধ্যে মধ্যে ছোট খাটো অলঙ্কার তৈয়ার করিয়া দিত, এবং মজুরী যৎসামান্যই লইত।

অবশ্য ছেদী তাহার স্ত্রীকে গহনা পরিতে দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইত না বা সেজন্য কোন জবাবদিহিও করিত না। তথাপি সতর্কতা অবলম্বনের জন্য এসব কাজ তাহার অলক্ষিতে গোপনেই করা হইত।

হাঁসুলী দুই চারিদিনের মধ্যেই ছেদির অজ্ঞাতে গড়িয়া দিবার করার করিয়া গয়াদীন মুচিবউকে বিদায় করিল এবং দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য চলিল। পথে ছজ্জুরাম বেণিয়ার সহিত সাক্ষাৎ! ছজ্জু যখন বলিল তাহার দোকানে এবার বেশ উৎকৃষ্ট খাঁটী গব্য ঘৃত আসিয়াছে, এবং খরিদ্দারও বিস্তর আসিতেছে তখন গয়াদীন আর বিলম্ব না করিয়া সেই নোট হইতে একখানি তাহাকে দিয়া পাঁচ টাকায় পৌণে তিনসের ঘৃত খরিদ করিয়া আনে, এবং বাকী দুই খানা নোট সিন্দুকে তুলিয়া রাখে।

তাহার পর মুচিবউকে ডাকিয়া আনানো হইল। তাহার এজেহারে

এই জালনোট-রহস্য সমস্তই ভেদ হইয়া গেল। মুচিবউ বলিল, দিন দুই অতীত হয় একজন রেলের কুলী এক পাটি ভারি বুট জুতা তাহার স্বামীর নিকট বিক্রয় করিতে লইয়া আসে. সে নাকি এই জুতাটী 'ট্রলগ' চালাইবার সময় হরিদ্বারের কাছে টনেলের মধ্যে পাইয়াছিল। জুতাটী প্রায় নূতন এবং খুব দামী চামড়ায় প্রস্তুত, তাই তাহার স্বামী নগদ দুইটী টাকা দিয়া তৎক্ষণাৎ খরিদ করিয়া লয়। এই জুতার জোড়া পাইলে সে দশ টাকা অনায়াসে রোজগার করিতে পারিত।

মুচি এবুটের চামড়া দিয়া এক জোড়া ছোট পায়ের জুতা তৈয়ার করিবে, এবং জুতা জোড়া বেশ ভাল দামে বিক্রী করিতে পারিবে স্ত্রীকে একথা জানায়। মতলব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সে বুটের তলার দিকটায় সবে মাত্র একটুখানি কাঁটিয়াছে, এমনি সময় তাহার এক দূর সম্পর্কীয় দেবর আসিয়া মুচিকে একটা বিশেষ কাজে ডাকিয়া লইয়া গেল।

মুচিবউ সেলাইয়ের সাজ সরঞ্জাম ও জুতাটী যথাস্থানে তুলিয়া রাখিতেছিল, সেই সময়ে হঠাৎ জুতার মোটা 'তল্লার' কাটা জায়গার ফাঁকে কাগজের মত কি একটা জিনিষ তাহার চক্ষে পড়ে। কাঁটির সাহায্যে তল্লার কর্ত্তিত অংশ আর একটু ফাঁক করিতেই তাহার মধ্যকার গুপ্ত স্থানে স্তরে স্তরে রক্ষিত নোটগুলি সে দেখিতে পাইল। তল্লাটা নষ্ট না করিয়া সে কৌশলে নোট কখানা বাহির করিয়া লয়। পাঁচ পাঁচ টাকার সর্ব্বশুদ্ধ দশখানা নোট সে পাইয়াছিল। তাহার মধ্যে তিনখানি গয়াদীন সোণারকে হাঁসুলী গড়াইবার অভিপ্রায়ে দিয়াছে, এবং বাকী সাত খানি নোট একটা ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া সে ঘরের চালে গুঁজিয়া রাখিয়াছে। এতগুলি নোট স্যাকরা বা স্যাকরাবধূকে রাখিতে দিলে তাহারা সন্দেহ করিতে পারে, তাই সে নিজের কাছেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইচ্ছা ছিল ইহা হইতে দশ পাঁচ টাকা বাহির করিয়া সে সুবিধা মত ক্রমশঃ

আরও দুই চারিখানি অলঙ্কার গড়াইয়া লইবে। কিন্তু সে বেচারি তো জানিত না এ নোটগুলি সমস্তই ভুয়ো। মুচিবউ সত্য কথাই বলিয়াছিল। সে জুতা তখনও যেমনকার তেমনি রাখা ছিল, মুচি কাটিতে অবসর পায় নাই। আর মুচিবউর সযত্নে লুক্কায়িত সাতখানি নোটও পাওয়া গেল। সেই সাতখানি স্যাকরার দুইখানি এবং থানেদারের ভৃত্যের প্রাপ্ত এক-খানি মোট দশখানি নোটই জুতার সহিত পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

মিঃ বোস দেখিলেন বুটের রবার নির্ম্মিত পুরু সোলের ভিতরে কর্ক দ্বারা নোট রাখিবার নিরাপদ গুপ্তস্থান এমন চমৎকার সুকৌশলে প্রস্তুত হইয়াছে, যে ইচ্ছানুসারে যখন তখন বাহির করা ও রাখা চলে। অথচ জুতা দেখিয়া এ রহস্য বুঝিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মিঃ বোস আশ্চর্য্য হইয়া সেই বুট জুতা নির্ম্মাতার বুদ্ধি কৌশলের মনে মনে বিস্তর তারিফ করিলেন, এবং আসামীর পরিত্যক্ত অন্য একটী পাটিবুটের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন, ঠিক তাহারই জোড়া বটে। কিন্তু সে বুটের তলা নিরেট, তাহাতে এসব বিশেষত্ব ছিল না।

মিঃ বোসের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার আসামী অরুণের অপরাধ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া গেল। দীনদয়াল বেকসুর খালাস পাইল, এবং এ মামলার সে সাক্ষীরূপে পরিগণিত হইল। আসামীকে দেখিয়া এবার সে চিনিতে পারিল যে এ সেই ভদ্রলোকই বটে, যাহার কাছে হাওড়া ষ্টেসনে সে নোট ভাঙ্গাইয়াছিল।

কিন্তু এ ঘটনায় মিঃ বোস সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। দুঃখিনী বেলার অশ্রু আর্দ্র করুণ মুখচ্ছবি, ও আশা আনন্দহীন তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া ডিটেক্‌টিভের কঠিন চিত্ত বাস্তবিকই ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন এ যাত্রায় অরুণের রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।

কুড়ি

অদ্য এই জাল নোট সংক্রান্ত মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তির দিন। হাই-কোর্ট জনাকীর্ণ। একজন বর্দ্ধিষ্ণু উচ্চকুলোদ্ভব সম্ভ্রান্ত ধনিনন্দনের লাঞ্ছনা ও ভয়াবহ পরিণাম দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া অনেকে হাতের কাজ ফেলিয়া এবং বহু অসুবিধা স্বীকার করিয়াও বিচারালয়ে আগমন করিয়াছিলেন।

কিন্তু হতভাগ্য অরুণ যখন হাতকড়ি বদ্ধ অবস্থায় সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হইয়া আসামীর কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন সমাগত ভদ্রমণ্ডলী একেবারে নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া গেল।

অরুণের সেই যৌবনের বলদৃপ্ত সুঠাম বলিষ্ঠ দেহখানি এই কয় দিনের ঝড় ঝঞ্ঝাবাতে যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া নুইয়া পড়িয়াছে। সেই দর্পিত উদ্ধত নির্ভীক যুবক আজ দুঃসহ লজ্জায় নিদারুণ অপমানে নত-দৃষ্টি, নতশির। সহনাতীত দুঃখে ক্ষোভে, গভীর মর্ম্মযাতনায়, তাহার সুগৌর সুশ্রী চেহারা যেন একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে। সে করুণ মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়া দর্শকদের মধ্যে অনেকের মনে কৌতূহলের চেয়ে করুণা ও সমবেদনা প্রবলতর হইয়া উঠিল, এবং সেই অপরিণামদর্শী সুন্দর তরুণ যুবকের শোচনীয় পরিণাম ও অন্ধকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করিয়া দুই এক জন দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তির নয়নকোণে অশ্রুর আভাসও জাগিতে দেখা গেল। বিচারগৃহের এক প্রান্তে একজন প্রবীণ ভদ্রলোকের পার্শ্বে

একটী সুন্দরী তরুণী বসিয়াছিলেন. এই দৃশ্য সহিতে না পারিয়া তিনি রুমালে চক্ষু ঢাকিলেন।

সাক্ষী সাবুদ সমস্তই উপস্থিত ছিল। অপরাধী বিচারকের সম্মুখে তাহার স্বপক্ষে একটিও কথা বলিল না, আত্মদোষ ক্ষালনের কোনও চেষ্টাই সে করিল না। অবিচলিত আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সহিত স্থির হইয়া অবনত মস্তকে দণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

বিচারক যখন সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে আসামীর দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন- জাল নোট চালান করা অপরাধে অপরাধীর সাত বৎসরের কারাবাস তখন সে ঈষৎ—ঈষৎ মাত্র শিহরিয়া উঠিল। সাত বৎসর--দীর্ঘ—অতিদীর্ঘ সাত বৎসর কাল—উঃ! কি ভয়ানক! দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত রুদ্ধশ্বাস। সেই তরুণীটী একটা অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি করিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলের দৃষ্টি তখন আসামীকে ছাড়িয়া যুগপৎ সেই মূর্চ্ছাতুরার দিকে আকৃষ্ট হইল। কেহ বলিল "মেয়েটির ফিটের ব্যামো আছে বুঝি?" কেহ বা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া—"এ সব ব্যাপারে আবার মেয়েছেলেকে আনা কেন বাপু? একি থিয়েটার না বায়োস্কোপ দেখা?" বলিয়া মনের বিরক্তি প্রকাশ করিল। আর যাহারা অরুণ ও বেলার প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার অবগত ছিল, তাহারা "আহা! মেয়েটির কি দুরদৃষ্ট!" বলিয়া সক্ষোভে সহানুভূতির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

দণ্ডিত আসামী অরুণ এতক্ষণ কোনও দিকেই চাহিয়া দেখে নাই। কিন্তু কাঠগড়া হইতে বাহির হইয়া বিপুল বেদনা, অবমাননা ও দুঃখের গুরুভার বহিয়া সে যখন বন্দীরূপে প্রহরী সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মত চলিয়া যাইতেছিল, সেই সময় সহসা তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল, সংজ্ঞাহারা বেলার সেই উষার আকাশের বিলীয়মান তারার মত দীপ্তিহীন পরিম্লান পাণ্ডুর

মুখখানি—অমনি তাহার ব্যথাভরা বুকের উপর কে যেন সজোরে কষাঘাত করিল।

এতক্ষণ পরে অরুণের অপমান-দগ্ধ তীব্র জ্বালাময় অশ্রুহীন আরক্ত চক্ষুদুটীতে তপ্ত অশ্রুর উচ্ছ্বাস হু হু নামিয়া পড়িল। সে অশ্রু অশ্রু নহে, হতভাগ্য বন্দীর অনুতপ্ত দীর্ণ বক্ষের উষ্ণ শোণিত-নিস্রাব।

"এখনো উঠলি না বেলা? আচ্ছা, এমন করে আর ক'দিন বাঁচবি বল্‌তো? যা হ'বার তাতো হয়ে গেছে, এখন তারি জন্যে না খেয়ে না ঘুমিয়ে দিনরাত কেঁদে কেঁদে প্রাণটা দিয়ে কি লাভ হবে বোন্? তুইতো অবুঝ নয়।"

ভূলুণ্ঠিতা, রুক্ষকেশা, দীনবেশা বেলা জয়ন্তীর ব্যথাভরা সস্নেহ অনুযোগে চক্ষের উদ্গত উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা মুছিতে মুছিতে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "এ পাষাণ প্রাণ এত সহজে যাবার নয় বউদি! নইলে তাঁর সেই দশা স্বচক্ষে দেখে, সেই নিষ্ঠুর শাস্তির আজ্ঞা কাণে শুনেও এখনো বেশ বেঁচে রয়েছি!"

বেলার অবলুণ্ঠিত আলুলায়িত কেশরাশিতে হস্তার্পণ করিয়া জয়ন্তী সান্ত্বনাময় কোমল কণ্ঠে বলিল, "ভগবান্ যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই করেন ভাই! আগুনে না পুড়লে সোণা খাঁটী হয় না, জানিস তো? তুই তার জন্যে এত দিন কি না করেছিস? কিন্তু নিষ্ঠুর সে তোর মর্ম্ম তো বুঝলে না, তোর এত বড় ত্যাগ, এত বড় দানের মর্য্যাদা সে তো রাখতে পারলে না! এখন তাকে তার কৃতকর্ম্মের ফল ভুগতে দে, দেখ এতেই যদি তার চক্ষু খোলে।"

"কিন্তু এ হতভাগীর জন্যেই যে আজ তাঁর এই নিগ্রহ, এই বিপত্তি, এ কথা যে আমি কোনও দিন ভুলতে পারব না বউদি! এ কথা যে আমার মনে চিরদিন কাঁটার মতই বিঁধবে! আমার সঙ্গে দেখা না হলে তাঁর জীবন কত সুখের, কত গৌরবের হ'ত সেটা একবার মনে ভেবে দেখ দেখি।"

"এ মিছে কথা। তোর দোষ কি ভাই! তুইতো তার সুখের পথ থেকে সরেই এসেছিলি, সে নিজেই উপযাচক হয়ে এলো, এসে তোর জীবনটাও নষ্ট করলে আর আপনিও অধঃপাতে গেল।"

"তা হলে তাঁর এই অধঃপতনের জন্যে শুধু আমিই কি দায়ী নই বউদি? বলো বউদি! এই কথাটা মনে করে' আমার বুকে যে দিন-রাত রাবণের অনির্ব্বাণ চিতা জ্বলছে!"

"কক্ষণো না, ওতো খালি একটা ছুতো ভাই! সংসারে দীন দুঃখী ভিখারী যারা তারা ও তো স্ত্রী পরিবার নিয়ে ঘর সংসার করছে। অরুণ যখন তোর জন্যে বাপ মা, আত্মীয় স্বজন, আর অত বড় রাজার সম্পত্তির লোভ অনায়াসে ত্যাগ করতে পারলে, তখন তোকে বিয়ে করে' সে সাধারণ গৃহস্থের মত স্বচ্ছন্দে না হক, সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারত নাকি? তা না করে' মিছে দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হয়ে সে নিজেও মজল, আর তোকেও মজালো। তার এ ভালবাসাকে আমি তো সত্যিকার ভালবাসা বলি না বেলা!"

"ভালবাসা নয়? তবে এ কি বউদি?"

"মোহ, আসক্তি।"

"তাই কি?"

বেলার অশ্রু-সজল সুন্দর মুখখানিতে ব্যথার চিহ্ন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। ব্যথিত আহত কণ্ঠে সে কহিল, "কিন্তু আমি তো তাঁকে সত্যিকার ভালবাসাই বেসেছি বউদি! বিয়ে না হ'লেও এতদিন মনে জ্ঞানে শুধু তাঁরই আরাধনা করেছি, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যা কর্ত্তব্য সেটা তো আমাকে এখন করতেই হবে।"

"তুই যে তার চেয়ে ঢের-ঢের বেশী করেছিস বেলা! কজন স্ত্রী স্বামীর জন্যে এতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারে? জীবনের সুখ শান্তি,

আশা আকাঙ্ক্ষা, সুনাম সম্মান সমস্তই তো তুই তারি জন্যে বিসর্জ্জন দিয়েছিস, সম্বলের মধ্যে ছিল গায়ের গহনা ক'খানা।"

নিরাভরণা বেলার পানে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া জয়ন্তী সদুঃখে বলিল, "তাও তো ঘুচিয়ে দিলি, তুই নিজের দিক থেকে করতে আর বাকি কি রেখেছিস বোন?"

বেলা সজল নয়নে ব্যথার চকিত ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "গহনার জন্য তুমি দুঃখ করছ বউদি? কিন্তু এ প্রাণ দিলেও যদি তাঁকে বাঁচান যেত, তা'হলে আমি তা'ও যে তক্ষুণি দিতে পারতুম ভাই!"

"তা আমি জানি। কিন্তু সে যখন হবার নয়, তখন এমন করে' নিজের হাতে নিজের গলা টিপে, ভগবানের দেওয়া এত বড় প্রাণটাকে তুই নষ্ট করছিস কেন বলদেখি?"

"আমার বেঁচে থেকেই বা কি হবে বউদি?"

বেলার হতাশ ক্লান্ত স্বরে ব্যথিত হইয়া জয়ন্তী তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল,—

"এখন হতাশ্বাস হলেতো চলবে না ভাই, মনে আশা রাখ, আশাতেই মানুষ বেঁচে থাকে। সাত বৎসরতো খুব অনেক দিন নয়।"

"বল কি বউদি? সাত বৎসর। উঃ! এতকাল, তাঁর আশা ধরে আমি কি বেঁচে থাকতে পারব বউদি?···একদিন, এক মুহূর্ত্ত যে কাটানো ভার হয়ে উঠেছে!"

"পারবি না? কিন্তু আমাকে দেখ দেখি বোন! যে আশা জীবনে, এ জন্মে পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই, সেই জন্মান্তরের আশা ধরে' প্রাণ ধারণ করে' আছি! সাত বৎসর কি এতই দীর্ঘ বেলা? যার প্রতীক্ষায় বেঁচে থাকা যায় না?"

জয়ন্তীর সেই সখেদ করুণ উক্তি বেলার সন্তাপিত চিত্তে আর এক নূতন বেদনার সৃষ্টি করিল।

জয়ন্তীতো মিথ্যা বলে নাই। এই সাতটী বৎসর ধৈর্য্য ধরিয়া কোনও-মতে কাটাইয়া দিতে পারিলে বেলা তাহার বাঞ্ছিত দয়িতকে পুনর্ব্বার ফিরিয়া পাইতেও পারে, কিন্তু হতভাগিনী বিধবার প্রিয় সম্মিলনের আশা কোথায় কতদূরে? জন্মান্তর কি সত্যই আছে?

অন্তরভেদী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বেলা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "যা বলেছ তা ঠিক বউদি! কিন্তু আমি সেই আশায় বেঁচে থাকলেও এত কষ্ট, এত অপমান সহ্য করে' তিনি কি এতদিন জীবন ধারণ করতে পারবেন? তাঁর অবস্থাটা তুমি একবার মনে করে' দেখ দেখি—যে একদিন রাজ-ঐশ্বর্য্য রাজ-সম্মানের অধিপতি ছিল, সে কিনা আজ জেলের কয়েদী—আঃ! সাধে কি আর এ পোড়া প্রাণ গলা টিপে বার করে' ফেলতে ইচ্ছে করে বউদি? আমার মতন দুর্ভাগিনী জগতে আর কে আছে ভাই! আমি যে সাগর ছেঁচা মাণিক পেয়েছিলুম কিন্তু রাখতে পারলুম না তো!"

বেলার চক্ষে পুনরায় অশ্রু উৎস বহিল, জয়ন্তী তাহার চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টায় বলিল, "স্থির হ' ভাই! ধৈর্য্য ধর! ধৈর্য্য ভিন্ন এখন তো আর কোনই পথ নেই। এ রকম উতলা অবসন্ন হয়ে পড়লে আর যে কিছুই করা হবে না।"

হতাশ ভরে বেলা বলিল, "করিবার আর কি আছে বউদি?—আমার সব কাজই তো শেষ হয়ে গেছে!"

"শেষ আর হল কই? তোর জীবনের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য যে এখনো বাকি আছে বেলা!"

বেলা তাহার জলভরা চক্ষের কাতর দৃষ্টি জয়ন্তীর স্নেহস্নিগ্ধ মুখে

দিকে মেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কথা আমি যে বুঝতে পারছি না বউদি! তুমি আমাকে এখন কি করতে বলো?"

"তার যে দুঃখ কষ্টের কথা এই মাত্র বলছিলি, তারই একটু লাঘব করে' এ দুর্দ্দিনে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা—"

বেলা পরম আগ্রহে বলিল, "কিন্তু সে কি করে' হবে ভাই!—আমি নিতে চাইলেও তাঁর এ দণ্ডের ভাগ আমাকে কেউ দেবে না তো!"

"তা জানি, তবে তুই মনে করলে স্নেহ প্রেম আশা আশ্বাস দিয়ে তার দুর্ব্বহ ঘৃণিত জীবন কি সার্থকতার মোহন স্বপ্নে ভরিয়ে রাখতে পারবি না? এইটুকু ক্ষমতা, এ শক্তি যে ভগবান্ সব মেয়েকেই দিয়েছেন বোন্!"

দুঃখিনী সর্ব্বহারা বেলা এতক্ষণে যেন অকূলে কূল দেখিতে পাইল। ধূলিশয্যা ত্যাগ করিয়া সে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল। তাহার পর ভক্তি শ্রদ্ধায় নত হইয়া জয়ন্তীর পদধূলি মাথায় লইয়া সে উচ্ছ্বসিত গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, "পারব,—দিদি! পারব—তুমি শুধু আমাকে আশীর্ব্বাদ করো। আজ থেকে আমার জীবনে শুধু এই একই কামনা একই লক্ষ্য রইল, এই লক্ষ্য নিয়েই আমি এখন বেঁচে থাক্‌ব,—থাক্‌তে পারব।

বাইশ

আজ সে বন্দী !

অতি ভয়াবহ নিষ্করুণ কঠিন কারাগার, তাহার দুর্ভেদ্য লৌহময় বিকট বাহুবেষ্টনী দিয়া বন্দীকে দিনরাত বিভীষিকাময় বক্ষের মধ্যে সাপটিয়া চাপিয়া আছে। সে নির্ম্মম কঠোর পেষণে অহরহ নিষ্পেষিত হইয়া সেই বিশ্বসংসার হইতে নির্ব্বাসিত, স্বাধীনতা ধনে বঞ্চিত হতভাগার জীবনের সুখ সাধ, আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আছে শুধু স্মৃতি, আর অনুভূতি,—যাহার অসহনীয় তীব্র দহন তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে মরণের অধিক যন্ত্রণা দিতেছে! যাহার তীব্র বিষে বিষাক্ত হইয়া কারাগারের রুদ্ধবায়ু ক্রমেই আরো দুর্ব্বিসহ, প্রাণান্তকর হইয়া উঠিতেছে—যাহার আর বিরাম নাই বিশ্রাম নাই!

তাহার নিভৃত বন্দী জীবনে এখন এই তো একমাত্র সম্বল! একমাত্র সঙ্গের সাথী!

ফাল্গুনের নির্ম্মল প্রভাত। তরুণ রবির সোণার কিরণ কারাগারের কৃষ্ণ কঠিন লৌহময় গরাদাগুলিতে প্রহত হইয়া এক ঝলক সেই বিষাদ ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার অবরোধ কক্ষের ভিতরে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। সেই আলোটুকুর দিকে লুব্ধ তৃষিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, বন্দী অরুণ, যাহার চক্ষে আজ বিশ্বের সমস্ত আলো নিঃশেষে নিভিয়া গিয়াছে!

প্রভাতের উদার মুক্ত নীলিম আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়া সুখময় স্নিগ্ধ বাতাসটুকু, এক একবার সেই ভাগ্যবিড়ম্বিতের সন্তপ্ত দেহ মনে মৃদু কোমল স্পর্শ বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দানের বৃথাই প্রয়াস পাইতেছিল।

বাহিরে রৌদ্র ভাসিত মুক্ত গগনতলে সশস্ত্র সতর্ক প্রহরী গম্ভীর মুখে সদর্পে বিচরণ করিতেছে। এক পার্শ্বে একটা নিশি জাগরণ-ক্লান্ত গৃহ-পালিত সারমেয় প্রভাতের সুখকরোষ্ণ ধরণী-বক্ষে আলস্য জড়িত দেহখানা এলাইয়া দিয়া আরামে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে।

কারাগারের সুউচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীরের উপর বসিয়া একটী ছোট পাখী ঘন ঘন পুচ্ছ নাচাইয়া মনের আনন্দে শীষ দিতেছিল। সে যখন যেখানে ইচ্ছা ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইতে পারে, তাহাকে বাধা দিবার, বারণ করিবার কেহই নাই।

ঈর্ষাদিগ্ধ জ্বালাভরা দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া অরুণ ভাবিতেছিল, একদিন সে-ও ঐ আনন্দময় মুক্তির জগতের প্রাণী ছিল,—কিন্তু আজ? হায় রে দুর্ভাগ্য!

এই বীভৎস কারাগারের দুর্লঙ্ঘ্য কঠোর আবেষ্টনী কি জানি তাহাকে এখনো কত দিন, কত রাত্রি, কত দণ্ড, কত প্রহর, কতবর্ষ, কত মাস—এমনি নির্ম্মমভাবে বন্দিত্বের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবে! এইতো মাত্র সাতটী দিন, সাতটী যুগের মতই কাটিয়াছে! এখনো এমনি কত দীর্ঘ দিন এ জীয়ন্তে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে!

মুক্তি! মুক্তির আশা আজ কোথায়? সে আর কেমন করিয়া মুক্তিলাভ করিবে? হতভাগ্য বন্দীর প্রতি দয়া করিয়া কে তাহাকে মুক্ত করিতে আসিবে? কেউ না!

তবে আজ যদি সে ঐ নিশ্বাস নিরুদ্ধকারী কঠিন গরাদগুলো নিজ বাহুবলে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঐ কর্ত্তব্যে অটল নিষ্ঠুর প্রহরীকে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী করিয়া এ যন্ত্রণাময় বন্দিত্ববন্ধন ঘুচাইতে পারিত—কিন্তু তাহাতেই বা কি লাভ? মুক্তিলাভ করিয়া সে এখন যাইবে কোথায়?

জেলের দাগী পলাতক আসামী, তাহার বিপুল কলঙ্কের বোঝা

বহিয়া কোথায় গিয়া লুকাইবে? লোকালয়ে কেমন করিয়া সে মুখ দেখাইবে? তাহার জঘন্য ঘৃণিত জীবন নির্ব্বাহের জন্য সে এখন কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে? এই বিশাল বিশ্বসংসারে সে যে এখন এক বিন্দু করুণা - একমুষ্টি ভিক্ষালাভের প্রত্যাশাও করিতে পারে না। জগতের কাছে সে এখন পাইবে শুধু ঘৃণা ও ছিছিক্কার।

তাহার উপর নিদারুণ বন্ধনভীতি পলায়িত বন্দীর অভিশপ্ত জীবনকে যে অহরহ কুম্ভীপাকে জড়াইয়া রাখিবে! অভাবের তাড়নায়, ক্ষুধার যাতনায় অধীর অন্ধ হইয়া তাহাকে হয় তো বাধ্য হইয়াই আবার এই পথেই আসিতে হইবে, আবার এই দুর্ব্বিসহ কারাযন্ত্রণা-ভোগ, এই ঘৃণিত বন্দী জীবন যাপন—আঃ! তবে,—তবে এখন মুক্তির উপায় কি?

উপায় একটী মাত্র আছে—আত্মহত্যা!

কিন্তু তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি অবিরত তাহার দিকে নিবদ্ধ। পরিধানের বস্ত্র এত সঙ্কীর্ণ যে গলায় ফাঁস জড়াইয়াও মরিবারও উপায় নাই। একখানা ছুরীও কাছে নাই যে বুকে বিঁধিয়া মরিবে!

তবে এক কাজ করিলে হয় না? গভীর নিশুতি রাতে, প্রহরীদের তন্দ্রাজড়িত চক্ষে ফাঁকি দিয়া বলিষ্ঠ দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া, ঐ ভীষণ লৌহ গরাদার উপর সজোরে, সবলে মাথাটা ঠুকিয়া দিয়া যদি একই আঘাতে এ পাপ প্রাণের অবসান করিয়া চির মুক্তি-পথের যাত্রী হইতে পারে—আঃ! সেই ভাল, সেই ভাল! সেই চেষ্টাই এখন সে দেখিবে।

কিন্তু আত্মহত্যা যে মহাপাপ,—অপঘাতে মৃত্যু সে যে বড় ভয়াবহ ব্যাপার। তবে তাহাতেই বা ভয় কি? বাঁচিয়া থাকিয়া এমন করিয়া

তিলে তিলে পলে পলে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে সে যে আর পারে না। মরণ ভিন্ন এ যন্ত্রণার শান্তি নাই তো!

আর তাহার মত দুর্ভাগ্য দুরাচারীর মরণে পৃথিবীতে কাহার কি ক্ষতি হইবে?—কাহারও না। তাহার জন্য কাঁদিতে এ সংসারে আর কে আছে? কেউ না!

পিতা?—পুত্রকলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া তিনি এতদিনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবেন,—সে তো পুত্র নয়—কুলাঙ্গার!

তবে মায়া—আদরের ছোট বোনটীর কথা মনে করিয়া অরুণের শুষ্ক চক্ষে অশ্রুর সঞ্চার হইল।

কিন্তু মায়া বালিকা,—সে হয় তো এতদিনে তার হতভাগ্য দাদার কথা ভুলিয়াই গিয়াছে, যদি না ভুলিয়া থাকে,—তবে লুকাইয়া এক ফোঁটা চক্ষের জল মুছিবে—তাহার পর আবার সব ভুলিয়া যাইবে। তাহার কলঙ্কিত দুঃখময় স্মৃতি মনে করিয়া রাখিবার জন্য কাহার মাথাব্যথা পড়িয়াছে?

তখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের একটী,—একটী মাত্র উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রের মত অরুণের ঘন অন্ধকারময় অন্তরাকাশে চকিতে ফুটিয়া উঠিল, বিচারালয়ে মূর্চ্ছাতুরা বেলার সেই শ্বেতপদ্মের মত শুভ্র করুণ আর্ত্ত মুখখানি! হায় রে! সেই কল্যাণরূপিণী দেবীকল্পা প্রেমময়ী নারী, সে যে তাহারই জন্য কত ক্লেশ কত লাঞ্ছনা অবমাননা সহ্য করিয়াছে, তাহাকে সুপথে ফিরাইবার জন্য সে কত যত্ন কত চেষ্টাই না করিয়াছে, সে তাহাকে এখনো প্রাণ মন অন্তর দিয়া কত,—কত ভালবাসে! এত হতাদর, এত নির্য্যাতনেও তাহার ভালবাসা যে বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই!

এখন দুর্ভাগা বন্দীর এই শোচনীয় অপঘাত-মৃত্যুর সংবাদ সেই প্রেম-সর্ব্বস্বা নারীর কুসুম কোমল বুকে বাজের মতই বাজিবে না কি?

এ আঘাত সহ্য করিয়া সে কি আর বাঁচিবে? না, না, এযে তার ভুল, বিষম ভুল। আত্মহত্যা না করিয়া বন্দী যদি এই জঘন্য কারাবাসে সাতটী বৎসর জীবিত থাকে, তাহা হইলে দণ্ড অন্তে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সে যখন তাহার কুৎসিত হতশ্রী ও দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ লইয়া বেলার সম্মুখে গিয়া প্রেমার্থী করুণার ভিখারী রূপে দাঁড়াইবে, তখন রূপসী তরুণী বেলা কি তাহার প্রণয়ীর ঘৃণিত কদাকার মূর্ত্তি দেখিয়া ঘৃণায় আতঙ্কে শিহরিয়া তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে না? নাঃ!—বাঁচা আর হইবে না। যেমন করিয়া হউক, অরুণকে এখন মরিতেই হইবে। কাহার জন্য কিসের প্রয়োজনে সে এত কষ্ট, এত হীনতা স্বীকার করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে? তাহার জীবনে তো সংসারে কাহারও কোনও প্রয়োজনই নাই।

চিন্তাবিষ্ট বন্দীর জটিল চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়া কারাকক্ষের রুদ্ধ দ্বার ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলিয়া গেল। ওয়ার্ডার আসিয়া জানাইল, একজন ভদ্রমহিলা বন্দীর সাক্ষাৎ অভিলাষিণী।

অরুণ চমকিয়া উঠিল। কে এ ভদ্রমহিলা? আবার কে? বেলা, নিশ্চয়ই সেই! ওঃ! সে এখানেও আসিয়াছে! দীনহীন অবজ্ঞাত বন্দীর দর্শনকামনায় এই কারানরকেও সে আসিয়াছে! আ! ভগবান্! ভগবান্! মরুভূমে এ ওয়েসীস বুঝি তোমারই করুণার অযাচিত দান?

কারাগৃহের শ্রী ফিরিল। দেবীরূপিণী বেলা যখন তাহার সেই দেব-বাঞ্ছিত রূপ-সম্পদ ও ব্যথা-করুণ সজল স্নিগ্ধ আঁখি দুটী লইয়া বন্দী অরুণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মুগ্ধ অরুণ নিমেষের জন্য ভুলিয়া গেল যে সে এখন জেলের কয়েদী।

যে পবিত্র মহৎ প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া অরুণ একদিন তাহার করতলগত সুখ সম্পদ, সম্মান প্রতিষ্ঠা সমস্তই তুচ্ছ

করিতে পারিয়াছিল, আজ বহুদিন পরে সেই সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বভোলা প্রেম, সেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অন্ধ অনুরাগ তাহার বিপর্য্যস্ত বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে পুনরায় উদ্দীপিত উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার ছিন্ন ভিন্ন মরম-বীণায় আজ আবার নূতন সুর বাজিল। স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া সে আবেগ-কম্পিত গদ্‌গদ কণ্ঠে ডাকিল. "বেলা! তুমি এসেছ বেলা?"

বেলা নীরব নিস্পন্দ। বন্দী অরুণের সেই কদর্য্য হীন অবস্থা, নিষ্ঠুর বন্দিত্ব, যাহা কোনও দিন বেলা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই, আজ সে তাহাই প্রত্যক্ষ দেখিতেছে, তাই অব্যক্ত অসহনীয় দুঃখে ক্ষোভে যেন তাহার কথা কহিবার শক্তিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বেলার সেই মৌনভাব অরুণকে অচিরেই তাহার তখনকার অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। অনুতপ্ত, লজ্জিত হইয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমার জন্যে তুমি আর অনর্থক কষ্ট করো না বেলা! ঘরে যাও পাপিষ্ঠকে তার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।"

বহুকষ্টে চিত্তাবেগ প্রশমিত করিয়া সে মৃদু করুণ সুরে বলিল, "কিন্তু তোমারি পাপ পুণ্যের ভাগী করে' তোমার সুখদুঃখের সাথী করেই যে ভাগ্যনিয়ন্তা আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন, তাঁর এ অলঙ্ঘ্য বিধান এড়িয়ে আমি আর কোথায় যাব?"

অরুণ বিস্ময়ে নির্বাক্ হইয়া গেল। এখনও এত প্রেম,—এত একাগ্রতা! বেলা মানবী না দেবী? এই দেবীকে সে অবহেলা অমর্য্যাদা করিয়াছে, তাই তো আজ এই শাস্তি!

হতভাগ্য অরুণের মর্ম্মস্থল কম্পিত মথিত করিয়া একটা গভীর দীর্ঘ-শ্বাস বাহির হইয়া গেল। সুগভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া সে বলিল, "সে সব কথা তুমি এখন মন থেকে মুছে ফেলো বেলা!—আমাদের এ নিষ্ফল ভালবাসার স্মৃতিকে একটা ক্ষণিকের দেখা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে

করো। পাষণ্ড ঘৃণিত জেলের কয়েদী তোমার মত দেবীর পবিত্র মহৎ প্রেমের কখনই উপযুক্ত নয়, তাকে ভুলে গিয়ে তুমি আবার—"

"তুমি ? তুমি আজ আমাকে এই কথা বলছ ? ওগো ! এ অভাগীকে এতদিন এত দুঃখ দিয়েও কি দুঃখ দেবার সাধ মেটেনি তোমার ? আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার আঘাত দিচ্ছ ?"

হতভাগিনী বেলার যত্ন-নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি এবার আর বাধা মানিল না, দরবিগলিত ধারায় বহিয়া সেই পরিম্লান কাতর মুখখানিকে এককালে প্লাবিত করিয়া দিল।

ব্যথাহত দীর্ণ বক্ষে অরুণ বলিল, "জানি, তুমি এ কথায় বড় ব্যথা পাবে, কিন্তু তোমার প্রতি আমারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে বেলা ! তোমার এত রূপ, এত গুণ, এই আশা আকাঙ্ক্ষায় ভরা তরুণ জীবন একটা পাপিষ্ঠ হীন বন্দীর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত করে' তুমি বৃথা কেন নষ্ট করবে ? তাতে যে তা'র পাপের ভার অপরাধের বোঝা আরও ভারি করে' তোলা হবে বেলা !"

বেলা অশ্রু মুছিতে মুছিতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তুমি যে-ই হও, আর যাই করো, আমার চক্ষে তুমি এখনো নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক, আর চিরদিন তাই থাকবে।

"আমি শুধু তোমার আশাতেই এই সাত বৎসর—"

"এতদিন ? এতদিন তুমি আমার প্রতীক্ষা করবে বেলা ?"

অরুণ নিরুদ্ধ নিশ্বাসে বেলার অশ্রুমলিন সুন্দর মুখের পানে অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বেলা অবিচলিত স্থির স্বরে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, কেবল এতাদন, এই সাত বৎসর কেন, যদি চিরদিন চিরজীবন, তোমার প্রতীক্ষায় থাকতে হয়, আমি তাই থাকব—আমি—"

বেলা কথাটা শেষ করিতে পারিল না। ওয়ার্ডার বাধা দিয়া বলিল, "আর দেরী করতে পারব না, সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।"

বন্দী অরুণের গায় তমসাচ্ছন্ন আঁধার জীবনে আশা ও আশ্বাসের সুবিমল জ্যোতি ফুটাইয়া, ক্ষত বিক্ষত দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা সান্ত্বনার মধুর স্নিগ্ধ প্রলেপে জুড়াইয়া দিয়া বেলা সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিল।

তেইশ

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার কয়েকদিন পরে অরুণের নামে একখানি পত্র আসিল, বন্দীর পত্র না দেখিয়া দিবার নিয়ম নাই, তাই জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহা খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্রখানি পাঠাইয়াছিল বেলা, সে লিখিয়াছিল—

—জীবনের সর্ব্বস্ব হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা আমার! তুমি শুনে সুখী হবে, আমার জীবনে আর কোনও দুঃখ কোনও ক্ষোভই নেই।

যদিচ, তোমার শাস্তির অংশ গ্রহণ করবার, তোমার দুঃখ লাঞ্ছনা নিবারিত করবার শক্তি আমার নেই, তবু তোমার নির্ব্বাসনের বাহ্যিক কষ্টগুলি যতদূর সম্ভব আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে' আমার মনক্ষোভ, প্রাণের বেদনা প্রশমিত করবার চেষ্টা করছি—সে চেষ্টা আমার হয়তো সফল হয়েছে, কারণ আমার মন এখন অচঞ্চল শান্তিতে পরিপূর্ণ।

আমার শোবার ঘরখানা তুমি যদি দেখো, তাহলে বোধ হয় চিনতেই পারবে না। সে ঘরের আসবাব পত্র বিলাসের সাজ সরঞ্জাম সমস্তই একেবারে নিশ্চিহ্ন করে' ফেলেছি। শুধু তোমার ফোটোখানা যেখানে যেভাবে তুমি রেখেছিলে, ঠিক সেইভাবেই রাখা আছে।

এ ঘর এখন আমার আরাধনার মন্দির, আমার প্রাণের দেবতার পবিত্র চরণ-স্পর্শপূত পুণ্যতীর্থ, এখানে আমার জয়ন্তী বউদি ভিন্ন আর কারও প্রবেশাধিকার নেই।

জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি বলেই আমি তাঁর মত দেবীকে সঙ্গিনীরূপে লাভ করেছিলুম।

তোমার ওখানকার আহার কি জানি না, জানবার চেষ্টাও কখনো

করিনি। উঃ! সে কথা মনে করতেও যে বুকখানা ফেটে যায়! রাজ-ভোগে যাঁর দিন কেটেছে, সে কি না আজ—নাঃ! ওকথা আর তুলব না—নৈ'হলে আমার আর চিঠি লেখাই হবে না।

আমার আহার কি জানো? একবেলা হবিষ্যান্ন। তাতেই আমি আছি ভাল। শরীরে কোনও গ্লানি নেই, মনেও কিছু চাঞ্চল্য নেই। আমি বেশ শান্তিতে আছি।

ঘরের সে পালঙ্কখানা তুলে দিয়ে তোমার মত ঠিক তোমারই মত মাটীতে একখানা কম্বল পেতে রেখেছি, সেই-ই আমার এখন পূজোর আসন, শয়নের শয্যা সবই। গভীর নিঝুম রাতে, যখন সারা বিশ্ব জগৎ ঘুমের ঘোরে স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন সেই ভূমিশয্যায় শুয়ে শুধু তোমারই ধ্যানে মগ্ন হয়ে আমি আকাশ পানে চেয়ে থাকি,—তখন আমার নিদ্রাহীন নিশীথ রাতের একমাত্র সাথী আকাশের অনির্ব্বাণ তারাগুলি, তা'দের সহানুভূতি ভরা জ্বল্‌জ্বলে হাজার হাজার চোখ মেলে—নির্ণিমেষ হয়ে চেয়ে থাকে। মনে হয় এই স্বর্গের দেবদূতেরা এই নিস্তব্ধ রাতে তোমার দিকেও ঠিক এমনি করে চেয়ে চেয়ে, তাদের নীরব সান্ত্বনায় তোমাকে অভিষিক্ত করে দিচ্ছে,—তখনই তোমার আমার মাঝখানের এই দূরত্ব, সেই পাষাণ প্রাচীরের দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধ লৌহ-কপাটগুলির বিরাট ব্যবধান যেন নিঃশেষে ঘুচে যায়।

মনে হয় তুমি আমার কাছে,—কত কাছে রয়েছ! আমার আঁধার প্রাণ আলো করে' তখন সেই দীপ্ত তারার মতই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে তোমার সেই পলকহারা, প্রেম-করুণায় ভরা স্নিগ্ধ মৌন আঁখি দুটী,—নির্জ্জন অন্ধকার ঘরের নিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে তোমারই পবিত্র মধুর অঙ্গ-সৌরভ, তোমারই মৃদু কোমল নিশ্বাসের সুখস্পর্শটুকু অনুভব করে', পুলকে প্রেমে

আত্মহারা হয়ে আমি আমাদের এই মর্ম্মান্তিক দীর্ঘ বিরহের কথা একেবারেই ভুলে যাই।

ভুলে যাই তুমি আমার কাছে নেই, ভুলে যাই তুমি আমার কাছ থেকে অনেক তফাতে, অনেক দূর দূরান্তরে এখন রয়েছ।

এই বিস্মৃতি, এই ধ্যানের তন্ময়তাই এখন আমার জীবনের পরম ও চরম সুখ। এইভাবে, এমনি করে, সাতটী বৎসর কাটিয়ে দেওয়া কি বড়ই কঠিন কথা?

আমার ভাবনা, আমার ভয় হয় কেবল তোমার জন্য। অসহ্য দুঃখ কষ্টে ধৈর্য্যহারা হতজ্ঞান হ'য়ে পাছে তুমি কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেলো। —না, না, তা' করোনা, করোনা!

ওগো আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! তোমার দুঃখ ক্লেশ যত কঠোর যতই অসহ্য হ'ক, এখন তুমি বীরের মত সব সহ্য করো।

মনে রেখো, তোমার দুঃখিনী বেলা শুধু তোমার জন্যে, শুধু তা'র ভ্রষ্ট স্বর্গে স্থান পাবার আশাতেই এখনো এ প্রাণ ধারণ করে আছে। মনে রেখো, এ দুর্দ্দিন,—এ দুর্য্যোগ চিরস্থায়ী নয়। দুঃখের 'পর সুখ, মেঘের পর রৌদ্র, তিমির ঘন দুঃখ-রজনীর অবসানে সুখময় প্রভাত উদয়, করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তার অপরূপ বিধানে এযে অবশ্যম্ভাবী।

তাই বলি প্রিয়তম! তুমি ধৈর্য্যভ্রষ্ট হ'য়ো না। তোমার অভাগী বেলাকে তার তপস্যার ফল, সাধনার সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত নিরাশ করো না তুমি; তোমার চরণে এখন আমার শুধু এই মিনতি।

—জেনো, তোমার বেলা চিরদিন তোমারি—একান্ত তোমারি থাক্‌বে। জগতের কোনও বাধা, কোনও বিপত্তিই তাকে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না—পারবে না।

আমি জীবনে মরণে তোমারি—"বেলা"।

সেই লিপির প্রত্যেক ছত্রে নারীর প্রেমের দীপ্ত মহিমা যেন উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। প্রত্যেক শব্দে একখানি ব্যগ্র ব্যাকুল করুণার্ত্ত মধুর হৃদয়ের অপরিসীম বেদনা ও সহানুভূতি ঝরিয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছিল।

সে পত্র পাঠ করিয়া জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কঠোর চিত্তও করুণায়, সমবেদনায় বিগলিত আর্দ্র হইয়া উঠিল।

এইরূপ পত্র, ইহাপেক্ষাও ব্যথাভরা সান্ত্বনাময় প্রেমলিপি বেলার নিকট হইতে প্রায় সদা সর্ব্বদাই আসিত। সে পত্রে পাষাণ বিগলিত হয়, মানবচিত্ত তো কোন ছার! প্রত্যেক সপ্তাহেই বেলা বন্দী অরুণের সহিত দেখা করিতে আসিত। সঙ্গে করিয়া আনিত আশা আশ্বাস আর আনন্দ।

সেই মহামহিমময়ী দেবী প্রতিমার কোমল চরণস্পর্শে সে নিরানন্দ অভিশপ্ত কারাগার যেন মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দময় স্বর্গলোকে পরিণত হইত।

হতভাগ্য বন্দীর সকল ব্যথা, সকল গ্লানি সে যেন নিমেষে মুছাইয়া দিয়া তাহার দুর্ব্বল ক্ষীয়মাণ শক্তিকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া দিয়া যাইত।

এই পত্র, এই সঙ্গটুকু, যুবক অরুণের অসংযত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তবৃত্তিকে যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে অচিরেই সংযত দৃঢ় ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া দিল। সেই নারী-রত্নের একাগ্র সাধনায়, প্রাণপাত যত্নে অরুণের কলঙ্কমলিন ভ্রষ্ট চরিত্র ক্রমশঃ অগ্নিশুদ্ধ স্বর্ণের মতই পবিত্র নির্ম্মল হইয়া উঠিল।

বন্দীর সততা ও শিষ্ট, ভদ্র আচরণে তাহার মেয়াদ-কাল দুই বৎসর কম করিয়া দেওয়া হইল।

পাঁচ বৎসর, সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে মুক্তিলাভ করিয়া, দীর্ঘ দিনের লাঞ্ছনা অবমাননা ও কলঙ্কের বোঝা বহন করিয়া অরুণ যখন সঙ্কোচ-জড়িত পদক্ষেপে, কারাগারের বাহিরে অবনত শিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সেখানে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, সেই গাড়ীতে ছিল বেলা।

বীরের সহধর্ম্মিণী যেমন তাহার বিজয়ী পতিকে শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে গৌরবে বরণ করিয়া লয়, বেলা তাহার চেয়েও আদরে, তাহার চেয়েও আনন্দে আগ্রহে তাহার ভাগ্য-নিগৃহীত, লাঞ্ছিত দয়িতকে, তাহার কঠোর তপস্যালব্ধ হারানিধিটিকে; দ্বিধাহীন অসঙ্কোচে নিজের পাশে তুলিয়া লইল।

শেষ

জয়ন্তীর যত্নে ও আগ্রহে বেলা ও অরুণের শুভ পরিণয় কলিকাতাতেই সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু তাহারা অতঃপর আর সেখানে বসবাস করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল না।

তাই বেলা তাহার পৈত্রিক বাটীখানি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া স্বদেশের সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া, স্বামীর সহিত এক অপরিচিত দূর বিদেশে চলিয়া গেল।

মাস দুই পরে জয়ন্তী সেখান হইতে বেলার একখানি পত্র পাইল। সে তাহাঁর সখী, গুরু, হিতৈষিণী জয়ন্তীকে শতকোটি প্রণাম ও প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা সানন্দে নিবেদন করিয়া লিখিয়াছে—

"বউদি ভাই!

তোমার ভবিষ্যদ্বাণী এবার সত্যই সফল হয়েছে। আমার জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি-বলে, আর তোমার আশীর্ব্বাদে—পাথর আজ যথার্থই পরশমণি হয়েছে। বাস্তবিক কাছে থাকলে দেখতে,—তিনি এখন নূতন মানুষ; তাঁর মনুষ্যত্ব, তাঁর দেবত্ব এখন এদেশে সর্ব্বসাধারণের আদর্শস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তোমার দুঃখিনী বেলার জীবনে আজ আর কোনও দুঃখ, কোনও অভাব নেই বউদি! অযাচিত আদরে, সোহাগে, অপরিমিত সুখে সম্পদে ভরিয়ে দিয়ে তিনি এ কাঙালিনীকে রাজরাজেন্দ্রাণীর আসনে তুলে বসিয়েছেন!

আমার জীবনের সুখ-স্বপ্ন, যৌবনের কঠোর তপস্যা এতদিনে সফল সার্থক হয়েছে বউদি! আমার সুখ আশাতীত, বর্ণনাতীত! কিন্তু আমার

এ সুখ সৌভাগ্যের মূলাধার তুমি, তুমি না থাকলে, তুমি দয়া না করলে—বোধ হয় এতদিন বেলার অস্তিত্বও এ জগতে থাকত না।

তাই আজ এ সুখের দিনে একটীবার ছুটে গিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে, যেমন সেই দুঃখের দিনে একটুখানি সান্ত্বনা পাবার জন্যে দুঃখের কান্না কাঁদতুম, তেমনি করেই একবার প্রাণ ভরে' সুখের কান্না কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তুমি যে আজ অনেক দূরে!

তাই আজ চিঠিতেই আমার সব পাওয়া প্রাণের অসম্বরণীয় আনন্দের উচ্ছ্বাস,—অন্তরের উচ্ছ্বসিত ভক্তি কৃতজ্ঞতা তোমাকে নিবেদন করছি।

সব চেয়ে আনন্দের, সব চেয়ে সুখের কথা এই যে, আমি আমার দেবতাকে তাঁর ভ্রষ্ট সিংহাসনে আবার দেবতার মতই পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। আমার নারী-জন্ম আজ ধন্য সার্থক হয়ে গেছে।

আবার বলি, বউদিমণি আমার! আমার অশুভ জীবনের তুমিই মঙ্গলময় শুভ গ্রহ, তুমি আমার কল্যাণময়ী ইষ্টদেবী—তোমার প্রসাদেই আমি আমার ব্যর্থজীবনে সার্থকতা লাভ করেছি,—আমার নষ্ট স্বর্গ আবার ফিরে পেয়েছি।"

অরুণ তাহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী বেলার সাহায্যে শুধু চরিত্রগত পরিবর্ত্তনই নহে, তাহার কর্ম্মজীবনেও বিলক্ষণ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে দেশে তাহার এখন মস্ত কারবার, বিপুল খ্যাতি প্রতিপত্তি। এক কথায় অরুণ এখন দশের একজন।

কালক্রমে চৌধুরী মহাশয়ও অপরাধী পুত্রকে ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং বেলাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ অবিনাশবাবু

তাঁহার স্নেহের পাত্রী বেলার মঙ্গলার্থে মিঃ বোসের সহায়তায় তাহার মাতৃগত অপবাদ মোচন করিতে পারিয়াছিলেন। বিস্তর চেষ্টা চরিত্র করিয়া তিনি বেলার জননীর যে অভিভাবক কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিকে এবং তাঁহাদের বিবাহ-সভায় আহূত কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে কাশী হইতে কলিকাতায় আনাইয়া মহেশবাবুর বিবাহ যে যথার্থই ধর্ম্ম ও শাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়াছিলেন।

পিতার বিলুপ্ত স্নেহ ও ক্ষমা লাভ করিয়া অরুণের জীবনে যেটুকু অভাব ছিল, তাহাও পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তাহার সকল সুখ সৌভাগ্যের মূলে ছিল, একটী মহীয়সী নারীর একাগ্রচিত্তের একনিষ্ঠ, পবিত্র পুণ্য 'প্রেমের পরশ'।